প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে প্রদত্ত গবেষণাপত্রের
৫০০০ শব্দের সারাৎসার

গবেষণার বিষয়

স্বাধীনতা-উত্তর বাংলা উপন্যাসে আদিবাসী জীবন-সমাজ-সংস্কৃতি
(১৯৪৭-২০০০)

গবেষক

বৈশাখী কুণ্ডু

বাংলা বিভাগ

প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়

রেজিস্ট্রেশন নং : R14RS02240058

রেজিস্ট্রেশন তারিখ : ২৯ জুন, ২০১৬

গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক

ড. উত্তমকুমার বিশ্বাস

সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ

প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়

বাংলা বিভাগ

৮৬/১ কলেজ স্ট্রিট, কলকাতা- ৭০০০৭৩

স্বাধীনতা-উত্তর বাংলা উপন্যাসে আদিবাসী জীবন-সমাজ-সংস্কৃতি

(১৯৪৭-২০০০)

৫০০০ শব্দের সারাৎসার

প্রস্তাবনা

২০১১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী ভারতের মোট জনসংখ্যার ৮.৬ শতাংশ আদিবাসী জনসংখ্যা, যা কিনা প্রায় ১০.৪৩ কোটি। পশ্চিমবঙ্গের আদিবাসী জনসংখ্যা ৫২,৯৬,৯৬৩ জন, যা পশ্চিমবঙ্গের মোট জনসংখ্যার ৫.৮ শতাংশ এবং দেশের আদিবাসী জনসংখ্যার ৫.০৮ শতাংশ। ভারতে ৭০৫টি জনগোষ্ঠীকে "তপশিলি উপজাতি"র অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে যে ৪০টি জনজাতি এই পর্যায়ভুক্ত, তারা হল- ১। অসুর, ২। বৈগা, ৩। বেদিয়া, ৪। ভূমিজ, ৫। ভুটিয়া, শেরপা, টোটো, দুকপা, কাগাতে, তিব্বতি, য়োলমো, ৬। বিরহড়, ৭। বিরজিয়া, ৮। চাকমা, ৯। চেরো, ১০। চিক বারাইক, ১১। গারো, ১২। গোণ্ড, ১৩। গোড়াইত, ১৪। হাজং, ১৫। হো, ১৬। কারমালি, ১৭। খারওয়ার বা খেরোয়ার, ১৮। খোন্দ বা খোণ্ড, ১৯। কিসান, ২০। কোড়া, ২১। কোড়োয়া, ২২। লেপচা, ২৩। লোধা, খেড়িয়া, খাড়িয়া, ২৪। লোহারা, লোহরা, ২৫। মগ, ২৬। মাহালি, ২৭। মাহলি, ২৮। মাল পাহাড়িয়া, ২৯। মেচ, ৩০। ম্রু, ৩১। মুণ্ডা, ৩২। নাগেসিয়া, ৩৩। ওঁরাও, ৩৪। পাহাড়িয়া, ৩৫। রাভা, ৩৬। সাঁওতাল, ৩৭। সৌরিয়া পাহাড়িয়া, ৩৮। শবর, ৩৯। লিম্বু, ৪০। তামাং।[১] ভারতের আদিবাসী সম্প্রদায়গুলির মধ্যে ৭৫টি গোষ্ঠীকে "Particularly Vulnerable Tribal Group" বলে চিহ্নিত করা হয়েছে, যার মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের টোটো, বিরহড় ও লোধা সম্প্রদায় রয়েছে। পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় প্রথম ভারতের ৫০টি আদিবাসী গোষ্ঠীকে এই নামে চিহ্নিত করা হয়, পরবর্তীকালে অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পর্যন্ত এই গোষ্ঠীর সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় ৭৫। যে যে বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে এই "Particularly Vulnerable Tribal Group" কে চিহ্নিত করা হয়েছিল, তা হল অর্থনৈতিক দিক দিয়ে পিছিয়ে থাকা, সর্বনিম্ন স্বাক্ষরতার হার, ক্রমহ্রাসমান জনসংখ্যা ও কৃষি পূর্ববর্তী প্রযুক্তির ব্যবহার। বর্তমানে তপশিলভুক্ত পশ্চিমবঙ্গের ৪০টি আদিবাসী জনগোষ্ঠীর মধ্যে ২০১১ সালের সেন্সাস রিপোর্ট অনুযায়ী বৃহত্তম হচ্ছে সাঁওতাল, জনসংখ্যা ২৫ লক্ষ ১২ হাজার ৩৩১। কিছু আদিবাসী গোষ্ঠীকে বাদ দিলে বেশিরভাগের সঙ্গে মূলস্রোতের সমাজ বা অনাদিবাসী সমাজ একেবারে বিচ্ছিন্ন ছিল – তা বলা যায় না ; পুঁজিবাদের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে

এই সম্পর্ক ও সহাবস্থানের সমীকরণও দ্রুত পাল্টেছে। তবুও বাংলা কথাসাহিত্যে দীর্ঘদিন অবহেলিত ছিল আদিবাসী জীবনের বাস্তবনিষ্ঠ পূর্ণাঙ্গ রূপায়ণ। বিশ শতকের প্রথম দিকে মূলত কল্লোল-কালিকলম সময়পর্ব থেকে বাংলা কথাসাহিত্যে অন্ত্যজ মানুষের গোষ্ঠীকেন্দ্রিক জীবনচর্চার শুরু। এই অন্ত্যজ জীবনচর্চার সূত্র ধরেই আদিবাসী জীবন-সমাজ-সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচয় বাংলা সাহিত্যের পাঠকের। ১৩২৯ বঙ্গাব্দের "মাসিক বসুমতী"র কার্তিক সংখ্যায় প্রকাশিত শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের *কয়লাকুঠি* গল্প পাঠককে চমকে দিয়ে বাংলা সাহিত্যের সীমানায় নতুন অভিজ্ঞতা নিয়ে আসে। রানিগঞ্জ-অণ্ডাল কয়লাখনি অঞ্চলে বেড়ে ওঠা লেখকের বাস্তব অভিজ্ঞতায় সম্পৃক্ত এই গল্পে পাই সাঁওতাল, বাউড়ি কুলি-কামিনদের জীবনের বিশ্বস্ত চিত্র। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সাহিত্যে এই "নবত্ব"-এর সমালোচনা করলেও আশাপূর্ণা দেবী বলেছেন - "অথচ এই শৈলজানন্দই একদা-বাংলা সাহিত্যের এক আশ্চর্য দিগন্তের উন্মোচন ঘটিয়েছেন। একটি অজানিত প্রাচীরের অজানিত দরজার কপাট খুলে দিয়ে অন্য জগতের হাওয়া এনে দিয়েছিলেন।...বাংলা সাহিত্য-পাঠকের জানা ছিল না তার জানা জগতের বাইরে একটি বিশাল সমাজজীবন আছে। সেখানেও রয়েছে নরনারীর চিরন্তন হৃদয় রহস্য। রয়েছে সততা উদারতা প্রেম মহত্ব আনন্দ বেদনা। তথাকথিত 'সভ্যতার' আলো না পেলেও তাদের মধ্যেও রয়েছে একটি ন্যায়-অন্যায় বোধের বিচারে গড়া অকৃত্রিম সভ্যতা।"[২] শৈলজানন্দ-তারাশঙ্কর-বিভূতিভূষণের কলমেই অন্ত্যজ, উপেক্ষিত মানুষদের কেন্দ্রের দিকে যাত্রা। সেই উপেক্ষিত, ব্রাত্য মানুষদের তালিকায় অন্যতম আদিবাসী সম্প্রদায়। এতদিন পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যের আঙ্গিনায় তাদের আনা-গোনা ছিল ঠিকই, কিন্তু জীবন-সমাজ-সংস্কৃতিকে বুকে করে তারাই প্রধান হয়ে ওঠেনি। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের ভাষায় যারা এই "অপজাত ও অপজ্ঞাত মনুষ্যত্বের"[৩] জনতা, তারাই বাংলা গল্প-উপন্যাসের মূল অবলম্বন হয়ে উঠবে - বাংলা কথাসাহিত্যে এই ধারার নির্মাণ বা প্রবণতার পেছনে শুধুমাত্র রবীন্দ্রবিরোধিতাজনিত দ্রোহচেতনা ছিল না, ছিল সেইসময়ের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহও। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ, রুশবিপ্লব, অসহযোগ আন্দোলন, মানবেন্দ্রনাথ রায়ের নেতৃত্বে ভারতে সাম্যবাদী আন্দোলন, ভারতে কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠা ও মার্কস-লেনিন চর্চা সেইসময়ের সাহিত্যচর্চাকে ও সৃষ্টিশীল মানসিকতাকে যে প্রভাবিত করেছিল, তা বলাই বাহুল্য। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় "কল্লোলে"র সেঅর্থে কেউ না হলেও বাংলা উপন্যাসে আদিবাসী জীবনের প্রতিষ্ঠা তাঁদেরই হাতে। *আরণ্যক* (১৯৩৯)-এ সত্যচরণের উপলব্ধির মধ্যে দিয়ে লেখক আদিবাসী জীবন ও সংস্কৃতির প্রতি এতদিনের অবজ্ঞা ও উপেক্ষার মানসিকতাকে বেআব্রু করলেন - "আজও বিজিত

হতভাগ্য আদিম জাতিগণ তেমনই অবহেলিত, অপমানিত, উপেক্ষিত। সভ্যতাদর্পী আর্যগণ তাহাদের দিকে কখনও ফিরিয়া চাহে নাই, তাহাদের সভ্যতা বুঝিবার চেষ্টা করে নাই, আজও করে না।"[৪] ১৯৪০-এ প্রকাশিত তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের *কালিন্দী* সাঁওতালদের অতীতের বিদ্রোহ ও বর্তমান পুঁজিবাদী শোষণ-বঞ্চনার ইতিবৃত্ত নিয়ে বাংলা উপন্যাসের ধারায় এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করে। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতে যে ধারার সূত্রপাত, স্বাধীনতা-উত্তরকালে তা আরও পরিপুষ্ট হয়েছে। বর্তমানে বাংলা উপন্যাসের একটি প্রবণতা যখন নাগরিক জীবন ও ব্যক্তিমানুষের জৈব প্রবৃত্তি, মানসিক সংকট, ক্লান্তি ও হতাশার কথা তুলে আনা, তখন সমান্তরালভাবে প্রবাহিত আরেকটি ধারায় উঠে আসে অন্ত্যজ মানুষদের গোষ্ঠীজীবনের কথা। মহাশ্বেতা দেবী জীবনব্যাপী যে আদিবাসী মহাদেশ আবিষ্কারের সাধনা ও ভারতের প্রকৃত ইতিহাসের সন্ধান করেছেন, উপন্যাসের ক্যানভাসে সেই চর্চায় নিবিষ্ট ছিলেন সতীনাথ ভাদুড়ি, সুবোধ ঘোষ, অমিয়ভূষণ মজুমদার, রমাপদ চৌধুরী, সমরেশ বসু, নারায়ণ সান্যাল, প্রফুল্ল রায়, দেবেশ রায় প্রমুখেরাও। পরবর্তীকালে সেই ধারার সার্থক উত্তরসূরি বুদ্ধদেব গুহ, ভগীরথ মিশ্র, নলিনী বেরা, সৈকত রক্ষিত, অনিল ঘড়াই প্রমুখেরা।

১৯৪৭ থেকে ২০০০ সাল অবধি সময়পর্বে বাংলা উপন্যাসের বিস্তৃত পরিসরে আদিবাসী জীবন-সমাজ-সংস্কৃতির কীরূপ প্রতিষ্ঠা ঘটেছে, মানব-মানবীর চিরন্তন প্রেম-ঘৃণা ও পারস্পরিক সম্পর্ক স্বীকার করেও তাদের সামাজিক-সাংস্কৃতিক ও জীবনসংগ্রামের কোন্ কোন্ দিক উঠে এল, অন্তর্বিদ্যামূলক গবেষণায় তাকেই ধরার চেষ্টা করেছি। এক্ষেত্রে বর্ণনামূলক আলোচনা পদ্ধতিকে অবলম্বন করেছি। আমার গবেষণা কর্মটিকে যেভাবে বিন্যস্ত করেছি তাতে প্রথমে আছে একটি প্রস্তাবনা, তারপরে ছয়টি অধ্যায় এবং শেষে উপসংহার।

প্রথম অধ্যায়

ভারতের আদিবাসী : ইতিহাস ও ঐতিহাসিক প্রেক্ষিত

এই অধ্যায়ে আমি ভারতের আদিবাসী সম্পর্কে একটা ধারণা ভারতের ইতিহাসের প্রেক্ষিতে দিতে চেয়েছি। ভারতের আদিবাসীদের সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। এদেশের আদিম অধিবাসীদের "আদিবাসী" নামে চিহ্নিতকরণ অপেক্ষাকৃত অর্বাচীন প্রবণতা। স্বাধীনতা-উত্তরকালে এই শব্দের ব্যবহার ব্যাপ্তি পেয়েছে। কিন্তু, ব্রিটিশ উপনিবেশকালে ভারতে

"অ্যাবরিজিন্স" শব্দটি আদিবাসী ধারণার ক্ষেত্রে তুলনামূলক বেশি প্রচলিত ছিল। ভারতের আদিবাসী চিহ্নিতকরণ নিঃসন্দেহে কঠিন কাজ। সমাজতাত্ত্বিকরা ভারতের আদিবাসী অনুসন্ধান ও চিহ্নিতকরণের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র ভৌগোলিকভাবে বিচ্ছিন্ন বা অর্থনৈতিক পশ্চাৎপদতা নয়, আরও যে লক্ষণগুলো দেখেছেন তা হল, একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলের একই সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যে বিশ্বাসী গোষ্ঠী, যাদের মধ্যে "common dialect" থাকবে, ধর্মবিশ্বাসের দিক দিয়ে যারা "সর্বপ্রাণবাদী" (animistic) এবং মানসিকভাবে যারা পরিবর্তনশীলতায় বিশ্বাসী নয়, নিজস্ব প্রাচীন প্রথা (old custom)র সঙ্গে জুড়ে থাকতে চায়, যাদের জীবন ও কৌম সমাজ পরিচালিত হয় নিজস্ব প্রথাগত আইন (customary law) দ্বারা। যদিও এই সমস্ত বৈশিষ্ট্যও আদিবাসী গোষ্ঠীর মানুষকে চিহ্নিত করার ক্ষেত্রে একমাত্র এবং সম্পূর্ণ নয়। অর্থনৈতিকভাবে আদিবাসী সম্প্রদায় প্রথমে পশুপালন, শিকার বা সহজপদ্ধতিতে শস্য উৎপাদনের সঙ্গে যুক্ত ছিল, যদিও পরিবর্তনশীল পরিস্থিতিতে বর্তমানে এরা বিভিন্ন পেশার সঙ্গে যুক্ত। চাষের কাজে বা কলকারখানার মজুরে ও খনিতে কুলি-কামিনে রূপান্তরিত হয়ে যাওয়া আদিবাসীদের সংখ্যাও প্রচুর।

বাংলা উপন্যাসে আদিবাসী জীবনের বাস্তবনিষ্ঠ রূপায়ণের অনুসন্ধান করতে গিয়ে প্রথমে যে প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়েছে, তা হল ভারতের আদিবাসী কারা? কোন্ কোন্ বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিকে আদিবাসী জনগোষ্ঠীকে অনাদিবাসী সমাজ থেকে পৃথক করা হয়? ভারতের সমগ্র অধিবাসীদের আবয়বিক বৈশিষ্ট্যকে এক্ষেত্রে গুরুত্ব দিয়েছেন নৃতাত্ত্বিকরা। বেশিরভাগ পণ্ডিত মনে করেন এদেশের উন্নত সিন্ধুসভ্যতা বা হরপ্পা-মহেঞ্জোদারো সভ্যতা ছিল প্রাগার্য সভ্যতা এবং আর্যভাষাভাষী জাতির ভারতের পঞ্চনদের তীরে এসে পৌঁছানো পরবর্তী বৈদিক সভ্যতার সঙ্গে এর বিশেষ পার্থক্য ছিল। শুধু তাই নয়, আর্যভাষী জাতির এদেশে প্রবেশের পূর্বেই এদেশের অধিবাসীরা কৃষি ও নগর সভ্যতার সঙ্গে পরিচিত ছিল। এদেশের আর্য-পূর্ব আদিবাসীদের মধ্যে অন্যতম প্রোটো-অস্ট্রালয়েড নরগোষ্ঠীর মানুষেরা কৃষিসভ্যতার সঙ্গে পরিচিত ছিল, যদিও এই গোষ্ঠীর সব শাখাই কৃষিকাজ জানত না, কিছুজন বনে-জঙ্গলে শিকার ও খাদ্যসংগ্রহ পদ্ধতিতে জীবনযাপন করত। আর হরপ্পা-মহেঞ্জোদারোর সভ্যতা ছিল নগরসভ্যতা। ফলে, বহিরাগত ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠীর মানুষই এদেশের সংস্কৃতিকে মূলত গ্রহণ করেছিল, নীহাররঞ্জন রায় বলেছেন, "বৈদিক আর্যভাষীদের বাস্তব সভ্যতা ছিল একান্তই প্রাথমিক স্তরের। খড়, বাঁশ, লতাপাতার স্বল্পকালস্থায়ী কুঁড়েঘরে অথবা পশুচর্মনির্মিত তাঁবুতে ইহারা বাস করিত; গো-পালন জানিত, পশুমাংস পোড়াইয়া তাহাই আহার

করিত এবং দলবদ্ধ হইয়া এক জায়গা হইতে অন্য জায়গায় ঘুরিয়া বেড়াইত। যাযাবরত্ব ত্যাগ করিয়া এ দেশে আসিয়া যথাক্রমে কৃষি অর্থাৎ গ্রাম-সভ্যতা এবং নগর-সভ্যতার সঙ্গে ধীরে ধীরে তাহাদের পরিচয় ঘটিল এবং ক্রমে তাহারা দুই সভ্যতাকেই একান্তভাবে আত্মসাৎ করিয়া নিজস্ব এক নূতন সভ্যতা গড়িয়া তুলিল। এই সভ্যতার বাহন হইল আর্যভাষা। এই দুই সভ্যতার সমন্বিত আর্যীকরণই হইল আর্যভাষীদের বিরাট কীর্তি; অথচ বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে তাহাদের একান্ত নিজস্ব কিছু তাহাতে বিশেষ নাই।"[৫] সেই আর্যভাষার বৈদিক সাহিত্যে আর্য-পূর্ববর্তী ভারতের অধিবাসীদের চিহ্নিত করা হল কোথাও "দাস", কোথাও "দস্যু" বলে। প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে প্রোটো-অস্ট্রালয়েড নরগোষ্ঠীর মানুষই "নিষাদ", "কোল-ভিল্ল" বলে পরিচিত হল।

ব্রিটিশ শাসনকালেই ভারতের আদিবাসী সম্প্রদায় চিহ্নিতকরণের প্রক্রিয়া মূলত শুরু হয়। বিদেশি শাসকগোষ্ঠী প্রশাসনিক কাজের সুবিধার জন্য এই প্রক্রিয়া শুরু করেন। ভারতের মূলস্রোতের জনগণের থেকে, হিন্দু-মুসলমান থেকে স্বতন্ত্র আদিবাসীদের সম্পর্কে জানা ও তাদের চিহ্নিতকরণ ছিল ব্রিটিশ সরকারের প্রশাসনিক উদ্দেশ্যে ভারতীয় সমাজকে সম্পূর্ণ জানার প্রয়াস। ব্রিটিশ প্রশাসক, নৃতাত্ত্বিক ছাড়াও পরবর্তীকালে মিশনারিরা ধর্মীয় উদ্দেশ্যে আদিবাসী এলাকায় কাজ করেছেন এবং আদিবাসী জীবনকেন্দ্রিক তাদের পর্যবেক্ষণকে লিপিবদ্ধ করেছেন। রিজলে, ডালটন এবং ও'ম্যালে মূলত পূর্ব ভারতের সমাজের ওপর কাজ করেছেন। রাসেলকে নিয়োগ করা হয়েছিল ভারতের মধ্যভাগের জন্য, দক্ষিণভারতের সমাজ নিয়ে থারস্টন এবং উত্তর ভারতের আদিবাসী সমাজের ওপর কাজ করেছেন ক্রুক। ভারতের আদিবাসী সম্প্রদায়ের ওপর বিস্তৃত কাজ করেছেন নৃতাত্ত্বিক রিভার্স। ভারতীয় মুণ্ডা, ওঁরাও, বিরহড়, খেড়িয়া সম্প্রদায়ের ওপর গবেষণা চালিয়েছিলেন শরৎচন্দ্র রায়। ভেরিয়ার এল্যুইন, নৃতাত্ত্বিক, যিনি ভারতে তাঁর কাজ শুরু করেছিলেন একজন খ্রিস্টান মিশনারি হিসেবে, ভারতের বৈগা, গোণ্ড প্রভৃতি একাধিক আদিবাসী গোষ্ঠীর ওপর দীর্ঘদিন গবেষণা করেছিলেন। ব্রিটিশ শাসক কর্তৃক "tribe" চিহ্নিতকরণের এই প্রক্রিয়ার সমালোচনা করেছিলেন জগন্নাথ পথি ও দ্যভল। পথি মনে করেছিলেন প্রাচীন ভারতে উপজাতি বা tribe-এর ধারণা ছিল না। এই ধারণা বা "উপজাতি মিথ" নির্মাণের ক্ষেত্রে ঔপনিবেশিক সরকারের অভিসন্ধি কাজ করেছিল, যার মধ্যে আর্থিক স্বার্থসিদ্ধি অন্যতম। কিন্তু বিনয়ভূষণ চৌধুরী তা মনে করেননি; বরং তিনি মনে করেছিলেন দ্যভল যে অর্থে "উপজাতি" শব্দকে ব্যবহার করেছেন, ব্রিটিশ প্রশাসকেরা সবসময় সেই অর্থে তা ব্যবহার করেননি; বরং

ব্রিটিশ আমলাদের ওপর হিন্দুসমাজের প্রভাব পড়েছিল।[৬] তবে এ কথা অনস্বীকার্য, ব্রিটিশ শাসনকালেই পুঁজিবাদের প্রসার, জমি, খাজনা ও জঙ্গলকেন্দ্রিক ব্রিটিশ সরকারের একাধিক নীতি “tribe” হিসাবে চিহ্নিত বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর শোষণে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছিল, যার প্রতিবাদে উপনিবেশকালে বেশ কিছু আদিবাসী বিদ্রোহ ঘটে। ঔপনিবেশিক সরকার বেশ কিছু আদিবাসী জনগোষ্ঠীকে “অপরাধপ্রবণ জাতি” হিসেবে চিহ্নিত করে দেয়।

স্বাধীনতার পরে ভারত সরকার কর্তৃক এই “অপরাধপ্রবণ জাতি” তকমা তুলে নেওয়া হয়। ভারতের সংবিধানের ৩৪২(১)[৭] ধারা অনুসারে রাষ্ট্রপতি বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে কোনো রাজ্য বা কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের কোনো উপজাতি বা উপজাতিভুক্ত সম্প্রদায় কিংবা তাদের কোনো অংশ বা গোষ্ঠীকে ঐ রাজ্যের বা কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের তপশিলি উপজাতি হিসেবে ঘোষণা করতে পারেন। ৩৬৬(২৫) ধারায় “তপশিলি উপজাতি”র সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে। রাষ্ট্রপতি “The Constitution (Scheduled Tribe) Order, 1950”-এ উপজাতি তালিকা নির্দেশ করেন এবং পরবর্তীকালে বিভিন্ন সময় সংশোধিত নির্দেশনামাও প্রকাশিত হয়। সংবিধানের পঞ্চম ও ষষ্ঠ তপশিলে উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চলগুলির জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণের কথা এবং পঞ্চম তপশিলে “Tribal Advisory Council” গঠনের কথাও বলা হয়। এছাড়াও সংবিধানে বৈষম্যমূলক আচরণের বিরুদ্ধে ও উপজাতি গোষ্ঠীর কল্যাণের জন্য, শিক্ষা ও সামাজিক দিকের উন্নতির জন্য বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ ও আসন সংরক্ষণের নির্দেশ রয়েছে। এভাবে ভারতের আদিবাসী সম্পর্কে ইতিহাস, নৃতত্ত্ব ও রাষ্ট্রের দৃষ্টির পরিচয় দেওয়ার প্রয়াস আছে এই অধ্যায়ে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

প্রাক্-স্বাধীনতা পর্বের বাংলা সাহিত্য : আদিবাসী প্রসঙ্গ

স্বাধীনতা-উত্তরকালে বাংলা উপন্যাসে আদিবাসী জীবন চিত্রণের যে ধারা সাম্প্রতিক সময়েও বহমান, প্রাক্-স্বাধীনতাপর্বের বাংলাসাহিত্যে সেই রূপায়ণ বিস্তৃত আকারে না থাকলেও আদিবাসী মানুষদের আনা-গোনা সাহিত্য প্রাঙ্গণে একেবারে ছিল না - এ কথা বলা যায় না। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন হিসেবে স্বীকৃত চর্যাপদগুলি এক বিশেষ ধর্মের গোষ্ঠীসাধনার নিদর্শন। বৌদ্ধ সহজিয়া সাধকদের ধর্মসাধনার উদ্দেশ্যে এগুলো রচিত হলেও সমাজের অন্ত্যজ ও প্রান্তিক

জীবনের প্রতিফলন ঘটেছে এই পদগুলিতে। বৌদ্ধধর্মের একটি বিশেষ শাখার তাত্ত্বিক বা আধ্যাত্মিক দিকের প্রকাশ চর্যাগানগুলির আত্মা হলেও চর্যাকারগণ এর দেহ রচনা করলেন বাংলার প্রকৃতি এবং হাড়ি, ডোম, কাপালিক, শবর-শবরী প্রভৃতি অনার্য ও অন্ত্যজ মানুষের জীবনচর্চার চিত্রে। শবর পা-এর ২৮ এবং ৫০ সংখ্যক পদে লোকালয় বা নগর থেকে দূরে পর্বতের ওপরে বসবসকারী শবর-শবরীর প্রেমময় উন্মত্ত দাম্পত্য জীবনের ছবি পাই। আদিবাসী জীবনের সহজ প্রকাশ উঠে আসে চর্যাগানে। বাংলা সাহিত্যের মধ্যপর্বের বিস্তৃত পরিসর জুড়ে রয়েছে মঙ্গলকাব্য ধারা। বাংলায় পালরাজাদের শাসনকালে বৌদ্ধধর্মের বিপুল প্রসার হলেও সেন রাজাদের সময় থেকে সনাতন ব্রাহ্মণ্যধর্মের প্রাধান্যই বর্ধিত হয়। এই সময়ে মঙ্গলকাব্যগুলোর আত্মপ্রকাশ সম্পর্কে আশুতোষ ভট্টাচার্য জানাচ্ছেন, দেশীয় ধর্ম সংস্কৃতির যে চর্চা সেনযুগের আগে বাংলার বুকে চর্চিত হত তা অবলুপ্ত হল না, সমাজদেহে থেকে গেল এবং বাঙালি হিন্দুদের সামাজিক জীবনের এই সন্ধিমুহূর্তে দেশীয় প্রাচীন সংস্কার ও ব্রাহ্মণ্য ধর্মের নতুন আদর্শের সংঘাতে বাংলা পুরাণ ও মঙ্গলকাব্যগুলি আত্মপ্রকাশ করেছিল।[৮] প্রাথমিকভাবে শিবের আর্যায়নের পরে শিবের পৌরাণিক মহিমায় ভর করে লৌকিক নারী দেবতা মনসা ও চণ্ডীর আর্যায়ন ঘটে। মঙ্গলকাব্যের প্রধান ধারা বা প্রাচীন ধারা এই লৌকিক দেব-দেবীদের মঙ্গলগীত। এখানে পৌরাণিক ও লৌকিক আখ্যানের মিশ্রণ স্পষ্ট। গিরিরাজ হিমালয়ের গৃহ থেকে শিবের মর্ত্যে এসে কৃষিকাজ করা, পার্বতীর বাগদিনী বেশ ধারণ বা শিবের শ্বশুরঘর থেকে মর্ত্যে কোচনি পাড়ায় গমন নিঃসন্দেহে আর্য ও অনার্য সংস্কৃতির মিশ্রণকে স্পষ্ট করে। *মনসামঙ্গল*-এ মনসার প্রসঙ্গে বলা যায় জলে-জঙ্গলে ঘেরা গ্রীষ্মপ্রধান এই দেশের লৌকিক সংস্কারে সর্পপূজা থাকা অস্বাভাবিক ছিল না। *চণ্ডীমঙ্গলের* উভয় কাহিনিতে সর্বোপরি দেবীর বরাভয়রূপ দেখতে পাওয়া গেলেও *আখেটিক খণ্ডের* দেবী আসলে অরণ্যের ও পশুদের অধিষ্ঠাত্রী দেবী, যিনি বিশেষভাবে ব্যাধসমাজে প্রতিষ্ঠিতা।

মধ্যযুগ পেরিয়ে বাংলা সাহিত্যের আধুনিকযুগের গোড়ার দিকে প্রাবন্ধিক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর *বিবিধ প্রবন্ধ* গ্রন্থের *বাঙ্গালীর উৎপত্তি* নামক প্রবন্ধে প্রসঙ্গক্রমে অনার্য ও এদেশের আদিম অধিবাসীদের ওপর খানিক আলোকপাত করেছেন। বাংলা ভ্রমণকাহিনি ধারায় সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের *পালামৌ* অন্যতম। সঞ্জীবচন্দ্রের প্রতিভা থাকা সত্ত্বেও তাঁর গৃহিণীপণার অভাব যে তাঁকে বাংলা সাহিত্যজগতে যথার্থ প্রতিষ্ঠা দিতে পারেনি, রবীন্দ্রনাথের এ আক্ষেপও সত্ত্বেও তাঁর অন্যান্য রচনার তুলনায় *পালামৌ* যে উৎকৃষ্ট রচনা – তা বলাই বাহুল্য। অরণ্যের আদিম অধিবাসী

কোলদের প্রথম বিস্তৃত পরিচয় ও রমণীয় বর্ণনা এই গ্রন্থকে ব্যতিক্রমী করেছে। এই গ্রন্থের দ্বিতীয় অংশে লেখক কোল বালকের শারীরিক সুষমার বিবরণ দিয়েছেন এবং অরণ্যপ্রকৃতির বুকেই অরণ্যের সন্তানদের রূপ যথার্থ প্রস্ফুটিত হয় বলে মনে করেছেন। এই গ্রন্থের চতুর্থ অংশে কোলদের নৃত্য ও পঞ্চম অংশে বিবাহের পরিচয় দিয়েছেন। কোল মূলত Austro-Asiatic ভাষাবংশের অন্তর্গত একটি শাখা, যা মূলত "মুণ্ডারি" নামে পরিচিত। *পালামৌ* গ্রন্থের দ্বিতীয় অংশে অসুর সম্প্রদায়ের প্রসঙ্গ আছে। এই অসুর নামক আদিবাসী সম্প্রদায় গভীর অরণ্য বা পাহাড়ে বাস করে। এদের উল্লেখ ঋক্‌বেদ, উপনিষদ ও পুরাণে পাওয়া যায়। প্রবোধচন্দ্র সেন মনে করেছিলেন আসুর ভাষা ব্যবহারকারী গোষ্ঠীই অসুর। ধাতু বা লোহা গলানোয় বিশেষ পারদর্শী, বলবান এই সম্প্রদায়ের সঙ্গে হরপ্পা-মহেঞ্জোদারো সভ্যতার বিশেষ যোগ ছিল বলে কোনো কোনো পণ্ডিত মনে করেন। বর্তমানে ঝাড়খণ্ড, বিহার, উড়িষ্যা ও ছত্তিশগড়ে এদের দেখতে পাওয়া গেলেও ধীরেন্দ্রনাথ বাস্কে রাঁচি জেলার নেতারহাটকেই তাদের আদিনিবাস বলে চিহ্নিত করেছেন।[৯] অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের *রাজকাহিনীর* চারটি কাহিনি যথা *শিলাদিত্য, গোহ, পদ্মিনী, বাপ্পাদিত্য* প্রকাশিত হয় "ভারতী" পত্রিকায় ১৩১১ বঙ্গাব্দে। *গোহ* ও *বাপ্পাদিত্যের* কাহিনিতে ভীলদের কথা আছে। কর্নেল টডের রাজস্থানের কাহিনিকে গ্রহণ করে স্বর্ণকুমারী দেবী লিখেছিলেন *মিবাররাজ* (১৮৮৭) ও *বিদ্রোহ* (১৮৯০)। *মিবাররাজ*-এ গোহ বা গুহ-র সময়কাল ও কাহিনি স্থান পেয়েছে এবং *বিদ্রোহ* উপন্যাসে আছে বাপ্পাদিত্যের পিতা নাগাদিত্যের সময়কাল ও ভীল বিদ্রোহের কাহিনি। উভয় ক্ষেত্রেই আদিবাসী ভীল গোষ্ঠীর প্রসঙ্গ এসেছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অগ্রজা স্বনামধন্য স্বর্ণকুমারী দেবী রাজস্থানের ভীল বিদ্রোহের ঐতিহাসিক উপাদানকে উপজীব্য করে উপন্যাস রচনা করলেও রবীন্দ্রনাথের কলমে আদিবাসী জীবন-সংস্কৃতিকে অবলম্বন করে পূর্ণাঙ্গ রচনা পাঠক পায়নি। দীর্ঘদিন আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চলে থাকার কারণে তাঁর কোনো কোনো রচনায় সাঁওতাল জীবনের ছায়া পড়েছে মাত্র। বাঁকুড়ার জনসভায় ১৩৪৬ বঙ্গাব্দের ১৮ই ফাল্গুন দেওয়া ভাষণে গ্রামবাংলার প্রতি তাঁর ভালোবাসার কথা ব্যক্ত হয়েছিল। সেখানে তিনি স্পষ্ট করেই গ্রামবাংলা বলতে শুধু প্রাকৃতিক শোভা নয়, মানুষকে বুঝিয়েছিলেন। মানুষের প্রতি তাঁর অকুণ্ঠ ভালোবাসার প্রসঙ্গেই টেনেছেন বীরভূমের রুক্ষ মাটির সঙ্গে লেগে থাকা সাঁওতালদের। তাদের সরলতায় মুগ্ধ হয়েছিলেন এবং তাদের প্রতি ভালোবাসার কথা জানিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। ১৯৩৬ সালে প্রকাশিত *পুনশ্চ* কাব্যগ্রন্থের *কোপাই* (১লা ভাদ্র, ১৩৩৯), *খোয়াই* (৩০ শ্রাবণ, ১৩৩৯), *ক্যামেলিয়া* (২৭ শ্রাবণ, ১৩৩৯) প্রভৃতি কবিতায় খণ্ডচিত্রে কখনও সাঁওতালরা এসেছে, কিন্তু তারা কখনওই কেন্দ্রীয় বিষয়

হয়ে ওঠেনি। একমাত্র *বিচিত্রা* (১৩৪২) কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত *সাঁওতাল মেয়ে* (৪মাঘ, ১৩৪১, শান্তিনিকেতন) কবিতার মূল অবলম্বন সাঁওতাল রমণী, যার দৈহিক মাধুর্যের পাশাপাশি অন্তর্নিহিত শক্তিকে ব্যক্ত করেছেন কবি। ১৮৮৭ সালে প্রকাশিত *রাজর্ষি* উপন্যাসে কুকি জনজাতির কথা এসেছে। সাঁওতাল বিদ্রোহের টুকরো প্রসঙ্গ এনেছেন *ইংরাজের আতঙ্ক* নামক প্রবন্ধে।

বিশ শতকের কল্লোল পর্বের গল্প-উপন্যাসে রানিগঞ্জের কয়লাখাদানের জীবনকে চিত্রিত করে বাংলা সাহিত্যের ভৌগোলিক সীমানাকে প্রসারিত করে বাংলার পাঠককে চমকে দেন শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়। কয়লাখাদানের কামিন বাউরি মেয়ে বিলাসি ও সাঁওতাল যুবক নান্‌কুর ভালোবাসা ও বিশ্বাসহীনতার গল্প *কয়লাকুঠি,* প্রকাশিত হয় ১৩২৯ বঙ্গাব্দের মাসিক "বসুমতী" সংখ্যায়। *কয়লাকুঠি* ছাড়াও *ঝুমরু, বনবিহগী, মরণ-বরণ, বন্দী, নারীর মন, সাঁওতাল* গল্পে আদিবাসী জীবন, কয়লাখাদান অঞ্চলের আদিবাসী কুলি-কামিনদের হৃদয় রহস্য, প্রেম-ভালবাসা-জিঘাংসার চিত্র উঠে এল। শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় আদিবাসী জীবন, খাদানের কুলি-কামিনের জীবনকে কথাসাহিত্যে স্থান দিয়ে বাংলা সাহিত্যের পাঠকের সামনে এক অজ্ঞাত জীবনের দ্বার খুলে দিয়েছিলেন। যাদের জীবন বাঙালি পাঠকের আশেপাশে ছিল, কিন্তু সমাজ-সংস্কার-দ্বন্দ্ব-সংঘাত নিয়ে তাদের বাংলা সাহিত্যে প্রবেশের অধিকার ছিল না; শৈলজানন্দ-বিভূতিভূষণ-তারাশঙ্করের হাতে সেই অধিকার প্রতিষ্ঠা পেল। *আরণ্যক* গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১৯৩৯ সালে। ভানুমতী তাদের অনার্য ইতিহাস ও ইতিহাসের স্মৃতি নিয়ে বাংলা সাহিত্যের জনপ্রিয় চরিত্র হয়ে উঠল। শুধু একক *আরণ্যকে* নয়, বিভূতিভূষণ তাঁর *কালচিতি, শিকারি* গল্পেও ফুটিয়ে তুলেছেন বর্তমান ঝাড়খণ্ডের অরণ্যপ্রকৃতি ও তাঁর সঙ্গে লগ্ন হয়ে থাকা আদিবাসীজীবনকে। বিভিন্ন সময়ে বিভূতিভূষণ আসাম, চট্টগ্রাম, মধ্যপ্রদেশ, ভাগলপুর, পূর্ণিয়া জেলার বিভিন্ন বনাঞ্চল, শিমুলতলা, সারান্ডা, রাঁচি, হাজারিবাগের বনাঞ্চল সন্নিহিত অঞ্চলে ঘুরেছেন আর সেই সময়কে শাশ্বত করেছেন বিভিন্ন ভ্রমণ কাহিনি ও দিনলিপিতে। ১৯৪০ সালে প্রকাশিত *অভিযাত্রিক*-এ মধ্যপ্রদেশের গোঁড় জনজাতির জীবন ও তাদের স্বভাবকে স্পষ্ট করেছেন। ১৯৩৪, মে থেকে ১৯৩৬, সেপ্টেম্বর পর্যন্ত লেখা দিনলিপি *উর্মিমুখর*-এ সাঁওতালি নাচ ও সাঁওতালদের আগুন পোহানোর চিত্র ও খণ্ডকথায় বন্যপশুদের সঙ্গে লড়াই করে বেঁচে থাকার ইঙ্গিত উঠে এসেছে। *হে অরণ্য কথা কও* ১৯৪২ থেকে ১৯৪৭ সালের মধ্যেকার দিনলিপি, অরণ্যপ্রকৃতির সঙ্গে আরণ্যক সাঁওতালদের কথা স্থান পেয়েছে এখানে। ১৯৪৫ সালে প্রকাশিত বনে পাহাড়ে ভ্রমণকাহিনিতে ঘাটশিলা-গালুডি-চাইবাসা থাকাকালীন সেখানকার

সাঁওতাল-হো অধিবাসীদের যে জীবনকে তিনি প্রত্যক্ষ করেছিলেন, তাকেই টুকরো চিত্রে তুলে ধরেছেন। স্বাধীনতা-পরবর্তীকালে প্রকাশিত *কুশল পাহাড়ি* গ্রন্থে এনেছেন বিরহড় জাতির কথা, খাদ্যাভ্যাসের কথা। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় গ্রামবাংলার প্রান্তিক জীবনের বিশ্বস্ত রূপকার। তাঁর প্রসারিত দৃষ্টিতে আদিবাসী জীবনও বাদ যায়নি। *পাষাণপুরী* (১৯৩৩), *প্রেম ও প্রয়োজন* (১৯৩৫), *কালিন্দী* (১৯৪০), *সপ্তপদী* (১৯৫৮), *অরণ্য-বহ্নি* (১৯৬৬)তে আদিবাসীজীবন তথা সাঁওতালজীবনের কথা উঠে এসেছে। *পাষাণপুরী, প্রেম ও প্রয়োজন* উপন্যাসে খণ্ডচিত্রে সাঁওতালদের কথা এসেছে। *কালিন্দী*তে দেখি জঙ্গলাকীর্ণ চরে বসত করে সেই চরকে মনুষ্য বসবাসের যোগ্য করে তুলেছে সাঁওতালরা। চরে বসবাসকারী সাঁওতালদের রীতি-নীতি, উৎসব, মিথের সঙ্গে সাঁওতালদের মধ্যেকার গোষ্ঠীজীবনের পরিবর্তনের ইঙ্গিত দিয়েছেন ঔপন্যাসিক। চরের জমি নিয়ে বিবাদের জেরে নিঃস্ব, শোষিত সাঁওতালদের শেষপর্যন্ত রাতের অন্ধকারে চলে যাওয়া তাদের জীবনে বারবার উদ্বাস্তু হওয়ার চরমতম ট্র্যাজেডি ও কঠিনতম সত্যিকেই প্রকাশ করে। রবীন্দ্র-পরবর্তী সময়ে ভিন্নধারার লেখক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখায় স্বল্প পরিসরজুড়ে এসেছে আদিবাসী সম্প্রদায়ের কথা। মানিক তাঁর জীবনে ও সাহিত্যে মার্ক্সবাদের প্রভাবকে স্বীকার করে নিয়েছিলেন। মাটির কাছাকাছি মানুষের জীবনের পূর্ণাঙ্গ ছবি তুলে আনতে না পারার খেদ তিনি পূরণের চেষ্টা করেছিলেন *দর্পণ* উপন্যাসের কিছুটা অংশে সাঁওতাল জীবন রূপায়ণের মধ্যে। উপন্যাসটি প্রকাশিত হয় ১৩৫২ সালের আষাঢ়ে। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের সাহিত্যিক জীবনের প্রথম পর্বের রচনায় নানা প্রসঙ্গে সাঁওতাল সম্প্রদায়ের কথা এসেছে। ১৩৫২ সালের চৈত্র মাসে, “প্রগতি” প্রকাশনী থেকে প্রকাশিত উপন্যাস *মন্দ্রমুখর*-এ স্বল্প পরিসর জুড়ে এদের অবস্থান। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের *বীতংস* গল্পগ্রন্থ প্রকাশিত হয় *মন্দ্রমুখর* প্রকাশের বছরেই, একেবারে প্রথমে (“নববর্ষ”, ১৩৫২সাল)। গল্পগ্রন্থের নামগল্প জুড়ে সাঁওতাল পরগণার এক সাঁওতালগ্রামের মানুষদের বিশ্বাস, উৎসব, জীবনচর্চা। সাঁওতালদের অন্ধবিশ্বাসের সুযোগ নিয়ে সাধু ছদ্মবেশী আড়কাঠি সুন্দরলালের সাঁওতালদের বাস্তুচ্যুত করে আসামের চা-বাগানের মজুর বানিয়ে তোলা। পুরো গল্পজুড়ে সুন্দরলালের সেই মজুর বানিয়ে তোলার ফাঁদের পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন। *স্বর্ণসীতা* উপন্যাসরূপে প্রকাশিত হয় ১৩৫৩ সালে। এর পূর্বে তা গল্পাকারে প্রকাশিত হয়েছিল। উপন্যাসের বিস্তৃত অংশজুড়ে কাহিনির সংগঠিত স্থানরূপে সাঁওতাল অধ্যুষিত অঞ্চল ও জনগোষ্ঠীর প্রসঙ্গ এসেছে, কিন্তু উপন্যাসের মূল ধারক সেই অনার্য মানুষজন নয়। বাংলা কথাসাহিত্যে শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের কলমে যে আঞ্চলিকতার বিশ্বস্ত ও ব্যাপক রূপায়ণের

সূত্রপাত, পরবর্তীকালে সতীনাথ ভাদুড়ি, সুবোধ ঘোষ, অমিয়ভূষণ মজুমদার, মহাশ্বেতা দেবী, রমাপদ চৌধুরী, সমরেশ বসু, নারায়ণ সান্যাল, প্রফুল্ল রায় প্রমুখের হাতে অন্ত্যজ ও প্রান্তিক মানুষদের গোষ্ঠীজীবনচর্চা। সেই ধারাতেই বাংলা উপন্যাসে আদিবাসী জীবনচর্চার প্রবেশ ও প্রতিষ্ঠা। সাম্প্রতিক সময়ে ভগীরথ মিশ্র, নলিনী বেরা, সৈকত রক্ষিত, অনিল ঘড়াইদের কলমে সেই ধারা যেমন গতি পেয়েছে তেমনই বিষয় বৈচিত্র্য ও প্রাচুর্যে সমৃদ্ধ হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়

স্বাধীনতা-উত্তর বাংলা উপন্যাস : আদিবাসী জনগোষ্ঠীর সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবন

বিশ শতকের গোড়া থেকেই জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে নানাবিধ ঘটনাপ্রবাহ ভারতীয় জনমানসে গভীর প্রভাব ফেলেছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আঘাত ভেঙে দিয়েছিল সব রোমান্টিক আবেশ। সেইসময় ব্যক্তিমানুষের মানসিক সংকট, হতাশা, মূল্যবোধহীনতা প্রভাব ফেলেছিল সাহিত্যেও। ভারতে কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠা, সাম্যবাদী আন্দোলন ও মার্কসবাদের চর্চা ভারতীয় শ্রেণিবিন্যাস ও আর্থিকভাবে শোষিত, বঞ্চিত প্রান্তিক মানুষদের আলোচনার আলোর তলায় নিয়ে এল। পরবর্তীকালে ভারতজোড়া স্বাধীনতা আন্দোলন, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, দাঙ্গা, দুর্ভিক্ষ সবরকম সামাজিক-রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক স্থিতাবস্থা ভেঙে দেয়। বাংলা উপন্যাসে তখন একদিকে অসন্তোষজনিত অস্থিরতা ও নাগরিক ক্লিন্নতা, মানসিক সংকট, প্রবৃত্তির নগ্নতা ও জটিল মনস্তত্ত্বের রূপায়ণ, অন্যদিকে নাগরিক জীবনের বাইরে প্রান্তিক কৌম সমাজ। অবশ্য ভাঙন সেখানেও। আদিবাসী সামাজিক-সাংস্কৃতিক জীবনেও তখন নাগরিক আগ্রাসন। স্বাধীনতা-উত্তরকালে জোরালোভাবে এই গোষ্ঠীজীবনের কথা, প্রান্তিক জীবনের কথা, শোষিত-উপেক্ষিত জীবনের কথা প্রকাশ পেতে থাকল। মহাদেশস্বরূপ বিরাট আদিবাসী জগৎকে আবিষ্কারের চেষ্টা দেখা গেল মহাশ্বেতা দেবীর মত অন্যান্য ঔপন্যাসিকদের লেখাতেও। সেই আবিষ্কারের ফলে বাংলা সাহিত্যের পাঠক আদিবাসী মানব-মানবীর চিরন্তন প্রেম-ভালোবাসা-ঘৃণার সম্পর্কের পাশাপাশি জানলো তাদের ধর্ম, ধর্মকেন্দ্রিক আচার-সংস্কার, সামাজিক রীতি-নীতি, প্রথা, বিধি-নিষেধকে। অন্ধ-বিশ্বাস ও কুসংস্কারের ভয়ংকরতায় কখনও কখনও আঁতকে উঠল। গবেষণাপত্রের এই অধ্যায়ে ভারতের বিভিন্ন আদিবাসী সম্প্রদায়ের সামাজিক-সাংস্কৃতিক জীবন বিভিন্ন উপন্যাসে কীভাবে উঠে আসছে বা ঔপন্যাসিকের কলমে তা বাস্তবনিষ্ঠ হয়ে উঠছে কিনা-তারই অনুসন্ধান করার প্রয়াস করেছি।

প্রফুল্ল রায় তাঁর *পূর্বপার্বতী* (১৯৫৭) উপন্যাসের ভূমিকায় বলেছেন "নাগাদের কাম-লালসা-হিংসা, ন্যায়-অন্যায় বোধ এবং দ্রুত পরিবর্তনকে কেন্দ্র করে ইতিহাসভিত্তিক উপন্যাস"[১০]। উপন্যাসে স্পষ্টতই দু'টি বিভাজন। প্রথম অংশে নাগাদের প্রেম ও প্রতিহিংসার আখ্যান এবং দ্বিতীয় অংশে ভারতের মূলস্রোতের স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গে তাদের জীবনকে মিলিয়ে দেওয়ার প্রয়াস। জোহেরি বংশের ছেলে জেভেথাঙ ও পোকরি বংশের মেয়ে নিতিৎসুর প্রেম ও প্রত্যাখ্যানকে কেন্দ্র করে কেলুরি ও সালুয়ালাঙ বস্তির মধ্যে যে হিংসা, হত্যা ও প্রতিহত্যা বংশপরম্পরায় চলতে থাকে ইতিহাসের পরিহাসে সেই প্রেমের আবার জন্ম হয় কেলুরির সেঙাই আর মেহেলির হৃদয়ে। এই ভালোবাসা পুরোনো হিংসা ও রক্তারক্তিকে ভুলিয়ে মান্যতা পেতে চায় এবং কাহিনি এগিয়ে চলে। মানুষের প্রেম ও ঘৃণার আখ্যান লিখতে বসে নিপুণ দক্ষতায় ঔপন্যাসিক নাগাদের রীতি-নীতি, সমাজ অনুশাসন, বিশ্বাস ও সংস্কারকে মেলে ধরেন। কথায় কথায় রক্তারক্তি বা head hunting -এ অভ্যস্ত সাহসি নাগারা কীভাবে অতিপ্রাকৃত শক্তিতে অবিশ্বাস্যরকম ভীত হয়ে পড়ে উপন্যাসে এরকম দৃষ্টান্ত একাধিকবার পাওয়া যায়। নাগা সমাজ গোষ্ঠীবদ্ধ। সর্দারই দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। সর্দারও প্রচলিত রীতি-নীতি, সংস্কার মেনে সমাজ পরিচালনা করেন। সমাজ অনুশাসন কখনও কখনও রক্তের সম্পর্ক, ভালোবাসার সম্পর্ককেও অস্বীকার করে অনুশাসনভঙ্গকারীকে কঠিন শাস্তি দেয়। মোরাঙে নারীপ্রবেশ নিষিদ্ধ, কারণ তারা বিশ্বাস করে নারীর প্রবেশে মোরাঙের শুদ্ধতা নষ্ট হয় এবং আনিজার রোষ এসে পড়ে তাদের ওপর। এমন কোনো অনভিপ্রেত ঘটনা ঘটলে গ্রামের সবাই উপোস করে এবং আনিজার উদ্দেশ্যে হলুদ কুকুর বলি দিয়ে আনিজার কাছে ক্ষমা চায়। উক্ত দোষে অভিযুক্ত খেজাঙের ঝোপে লুকিয়ে থাকা চিনাসাঙবার ওপর বর্শা দিয়ে প্রথম আঘাতটা করতে চায় প্রেমিক উলুবাঙই। অতিপ্রাকৃত শক্তি ও সামাজিক অনুশাসনের ভয়ে প্রেমিকও প্রিয়তমাকে কঠিন শাস্তি দিতে চায়। ভিন্ন গোষ্ঠী অঙ্গামী ও রেঙমাদের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন নিষিদ্ধ। সামাজিক অনুশাসনের নির্মমতা ও অতিপ্রাকৃত শক্তির প্রভাব নাগাদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনকে কীভাবে পরিচালিত করেছে - উপন্যাসজুড়ে তারই নির্মাণ। নারায়ণ সান্যাল তাঁর *দণ্ডক-শবরী* (১৯৬২) উপন্যাসে দণ্ডকারণ্যের বিভিন্ন আদিবাসী গোষ্ঠীর সামান্য পরিচয় দিয়ে মূলত মুরিয়া গোষ্ঠীর জীবন-সমাজ-সংস্কৃতির সম্যক চিত্র তুলে ধরেছেন। কাহিনির মোড়কে মুরিয়াদের কথা বিস্তৃতভাবে জানালেও ঔপন্যাসিক খানিক আভাস দিয়ে গেছেন মারিয়া জীবনের। মারিয়াদের কথা বলতে গিয়ে অবশ্যম্ভাবীরূপে এসেছে তাদের গোড়-নৃত্যের কথা। মুরিয়া সমাজ মূলত ঘটুলকেন্দ্রিক, মনে করা হয় মুরিয়া সমাজের আদি ও আদর্শ বীরপুরুষ লিঙ্গোপেনের সময় থেকেই

এই ঘটুল প্রথা চলছে। মুরিয়া গোষ্ঠীর সমস্ত অবিবাহিত যুবক-যুবতিই ঘটুলের সদস্য। ঘটুল মূলত দুই প্রকার - জোড়িদার ঘটুল ও নয়া ঘটুল। ঘটুলের সমস্ত পুরুষ "চেলিক" আর নারী "মোটিয়ারী" বা "মোতিয়ারি"। ঘটুলের প্রাচীন প্রথা ছিল বিবাহ-পূর্ববর্তী সময়ে একজন চেলিক ও একজন মোটিয়ারী জোড় বাঁধবে এবং পরস্পরের প্রতি বিশ্বস্ত থাকবে। বিবাহ সূত্রে আবদ্ধ হবে। তবে ঘটুলের অপেক্ষাকৃত নতুন নিয়মে এই একগামিতার ধারণা খারিজ হয়ে যায়; বরং সেখানে থাকে সাম্যের ভাবনা। এই নতুন নিয়মে প্রতি চেলিক-মোটিয়ারী টানা মাত্র তিনদিনের জন্য জোড় বাঁধতে পারে। এক্ষেত্রে কোন্ চেলিক কোন্ মোটিয়ারীর সঙ্গে জোড় বাঁধবে তা ঠিক করে ঘটুলের শিরদার বা বেলোসা। এই নিয়মে ঘটুলে কোনো চেলিক বা মোটিয়ারীর ওপর কোনো চেলিক বা মোটিয়ারীর অধিকার স্বীকৃত নয়। উৎসবের পরিচয় দিতে গিয়ে লেখক দেখালেন চৈতদাণ্ডার উৎসব ছাড়াও মুরিয়া সমাজে পৌষকুলাঙ উৎসব প্রচলিত। এই উৎসবে অংশ নেয় শুধুমাত্র ছেলেরা। জানুয়ারি মাসে হয় ভীমূল পাণ্ডাম, বৃষ্টির দেবতার পুজো। মার্চে ইরপু পাণ্ডাম, মহুয়া গাছের উৎসব, মারকা পাণ্ডাম আমের উৎসব ও তিল খানি তৈল বীজের উৎসব। মুরিয়াদের বিয়ে হয় ভিন্নগোত্রে। সগোত্রে বিবাহ মুরিয়া সমাজে নিষিদ্ধ। নারায়ণ সান্যাল মানবমনের নিগূঢ় রহস্যের উন্মোচন ও মানবপ্রেমের আখ্যান রচনা করতে গিয়ে সহায়ক উপাদান ও পটভূমি হিসেবে মুরিয়া সংস্কৃতিকে এখানে তুলে ধরেছেন। বুদ্ধদেব গুহ *পারিধী* (১৯৭১) উপন্যাসে নর-নারীর প্রেমের সুবেষ্টনীর মধ্যে সুনিপুণভাবে এঁকে দিয়েছেন কন্দ সংস্কৃতি ও জীবনচর্চাকে। উপন্যাসে উড়িষ্যার অন্যতম বৃহৎ আদিবাসী গোষ্ঠী কন্দ বা কন্ধ বা খন্দর জীবন ও সংস্কৃতির খানিক পরিচয় মেলে। এদের সমাজ পিতৃতান্ত্রিক। তবে সমাজে মেয়েদের স্বাধীনতা স্বীকৃত ও নারী সম্মান রক্ষার প্রতি সমাজ বিশেষভাবে দায়বদ্ধ। স্পর্শ বলতে শুধু চামড়ার স্পর্শ নয়, চাহনির স্পর্শ ও তার সু বা কু'ও তাদের কাছে বিচার্য। সমাজে আচরণের ক্ষেত্রে কঠোর অনুশাসন বলবৎ আছে। মুণ্ডা সমাজে শোনেঘরের মত কন্দ সমাজেও অবিবাহিতদের জন্য ঘুমোবার ঘর বা Dormitory ব্যবস্থা আছে। উনিশ শতকের গোড়ার দিকে কন্দ গোষ্ঠী ব্রিটিশ শাসকের বিশেষ নজরে আসে তাদের মেরিয়া বা নরবলি প্রথার জন্য। মেজর জন ক্যাম্পবেল সাহেবকে দায়িত্ব দেওয়া হয় এই নৃশংস প্রথার অবসানের জন্য। ১৩ বছরের চেষ্টায় শেষপর্যন্ত এই প্রথা বিলুপ্ত হয়। মেরিয়া রক্ত বা বলির সঙ্গে আসলে যুক্ত ছিল কন্দদের রোগমুক্তির ধারণা। কন্দরা আত্মার অবিনশ্বরতা ও পুনর্জন্মবাদে বিশ্বাসী। তাই জন্ম-অনুষ্ঠানের পূজার সময় গ্রামের পুরোহিত একটা ধনুক ধরে দাঁড়িয়ে থাকে নবজাতকের বাড়ির সামনে এবং শিশুটির পূর্বপুরুষের নাম বলে যান। যে নাম উচ্চারণের সময়

ধনুকটি কেঁপে ওঠে, মনে করা হয় সেই পূর্বপুরুষের আত্মাই উত্তরসূরি হয়ে ফিরে এসেছে।

ত্রিপুরার বিশিষ্ট কথাসাহিত্যিক বিমল সিংহ তাঁর *লংতরাই* (১৯৮৪) উপন্যাসের ক্যানভাসে ফুটিয়ে তুলেছেন ত্রিপুরার অন্যতম আদিবাসী জনগোষ্ঠী রিয়াং সম্প্রদায়ের জন্ম-মৃত্যু-বিবাহের চিত্র। এই বৃত্তের মধ্যে আরও ধরা পড়েছে রিয়াং সমাজের রীতি-নীতি, বিশ্বাস-সংস্কার, আচার-অনুষ্ঠান ও সর্বোপরি জীবন-জীবিকার সংগ্রাম। কঠিন জীবন সংগ্রামের মধ্যেও রিয়াংদের জীবনে গান ও সুরের অভাব ঘটে না বলেই উপন্যাসের অনেকটা স্থান জুড়ে আছে রিয়াং সমাজে প্রচলিত গান। রহস্যময় ক্ষমতাবান প্রকৃতি অসহায় মানুষের জীবনে, বিশ্বাসে দেবত্ব পায়; তাকে ঘিরে গড়ে ওঠে নানা কল্পকথা। ঔপন্যাসিক জরকামুনি ও সাজেরুঙের সন্তানকে কেন্দ্র করে রিয়াংসমাজের সন্তানভূমিষ্ঠ করার রীতি-পদ্ধতি, আচার ও তদ্জনিত বিশ্বাস এবং সংস্কারকেও তুলে আনলেন। অমিয়ভূষণ মজুমদারের *বিনদনি* উপন্যাস প্রকাশিত হয় ১৩৯২ সালে শারদীয়া "সপ্তাহ" পত্রিকায় ও *মাকচক হরিণ* শারদীয়া দৈনিক "বসুমতী" পত্রিকায়, ১৩৯৮ সালে। উপন্যাসদু'টি পরস্পর সম্পর্কিত। বিস্তারিতভাবে বললে *বিনদনি* উপন্যাসের দ্বিতীয় বা শেষ পর্ব হল *মাকচক হরিণ*। "মাকচক" রাভা শব্দ, যার অর্থ "হরিণ"। *মাকচক* গল্পের শেষে একটি হরিণের প্রসঙ্গে বনের মধ্যে একা হয়ে যাওয়া হরিণ বা শেষ হরিণের কথা বলা হয়েছে, যা আসলে রাভাদের অস্তিত্বের সংকটকেই ব্যঞ্জিত করেছে। *বিনদনি* ও *মাকচক হরিণ* উপন্যাসদ্বয় ও *মাকচক* গল্প – রাভা জীবন কেন্দ্রিক এই বিস্তৃত ক্যানভাস জুড়ে আছে আসলে রাভা মানুষদের শিকড়ের সন্ধান। রাভা সমাজ মাতৃতান্ত্রিক। সন্তানেরা মায়ের গোত্র পায়। *বিনদনি* ও *মাকচক হরিণ* উপন্যাসদ্বয় আসলে এক লড়াইয়ের কথা বলে। রাভা অস্তিত্ব রক্ষার জন্য জনাদনের লড়াই। প্রায় হারিয়ে যাওয়া শিকড়ের সন্ধান, মূলস্রোতের অন্য সংস্কৃতিতে মিশে যাওয়ার যে সংকট প্রায় সব আদিবাসী সংস্কৃতির বর্তমান বিপদ, জন তার বিপরীতে দাঁড়িয়ে একা লড়াই করেছে।

মহাশ্বেতা দেবীর *জঙ্গল* উপন্যাসটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৮৬ সালে, "ঋতুপত্র গাঙ্গেয়" পত্রিকায়। উপন্যাসটি খেড়িয়া শবরদের অবস্থা ও নৃশংস ডাইনি প্রথার কথা উঠে আসে আর *জানগুরু* (১৯৯৫) উপন্যাসে ডাইনি শিকারের নৃশংসতা তুলে ধরেন ভগীরথ মিশ্র। "ডাইনি" প্রসঙ্গ এসেছে *পূর্বপার্বতী* ও *দণ্ডক-শবরীতেও*।

মুণ্ডা সমাজ ও সাংস্কৃতিক বাতাবরণে আধুনিকের সঙ্গে প্রাচীনের চিরকালীন দ্বন্দ্বের কাহিনি বুদ্ধদেব

গুহের *সাসান্‌ডিরি* (১৯৯০)। ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা ও বিশ্বায়নের জেরে মুণ্ডা কৌম সমাজে ঢুকে গেছে আধুনিকতা। তবে এ আধুনিকতা বস্তুগত, সিরকা যাকে মুণ্ডাদের লোভ হিসেবেই দেখতে চায়। প্রাজ্ঞ সিরকা মুণ্ডা সমাজের ধর্ম ও সামাজিক রীতি-নীতিকে রক্ষা করেই আধুনিকতাকে সমর্থন করে। মানুষের স্বাধীনতা, মেয়েদের কথা বলার অধিকারই সিরকার চোখে আধুনিকতা। অথচ, চাটানের কাছে আধুনিকতা বলতে বোঝায় টিভি বা কম্পিউটারের অধিকার। বিশ্বায়নের জেরে মুণ্ডা সমাজ নিজেদের সংস্কৃতিকে ভুলতে বসেছে। ক্ষমতাশালী কেন্দ্রিক বা মূলস্রোতের সংস্কৃতির আগ্রাসন থেকে মুণ্ডা সংস্কৃতিকে আগলে রাখার ও না পারার ক্ষোভ উপন্যাসজুড়ে। উপন্যাসজুড়ে মুণ্ডা বিশ্বাস, সংস্কৃতি, অনুশাসন, জন্ম-মৃত্যু-বিবাহের রীতি-নীতি। তাদের বিশ্বাস ও গড়ে ওঠা সংস্কারজুড়ে আসলে ঈশ্বরচেতনা। স্বর্গে সিঙবোঙা ও নিচে সিঙবোঙা কর্তৃক সৃষ্ট পঞ্চায়েত মুণ্ডা সমাজের অনুশাসন ধরে রাখেন। "আল" বা সীমারেখা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় মুণ্ডা জীবন। যে মুণ্ডা সমাজে নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশায় কোনও বাধা নেই, বিশেষত নারীর সঙ্গী নির্বাচনের মত স্বাধীনতা রয়েছে, সে সমাজও পরপুরুষ পরনারীর সংস্রবকে মহাপাপ বলে মনে করে। জাতিচ্যুত করে। জাতিচ্যুত ব্যক্তি মুণ্ডা সমাজের কাছে অতীত হয়ে যায়। নিজেদের গোষ্ঠী বা কিলির মধ্যে যৌন সম্পর্কও মুণ্ডারা স্বীকার করে না, যেমন স্বীকার করে না সাকামচারি বা বিবাহ-বিচ্ছেদ না করে অন্য সম্পর্কে লিপ্ত হওয়া। বিয়ের মত জন্মের পরেও মুণ্ডা সমাজ কিছু আচার পালনের মধ্যে দিয়েই নবজাতককে সমাজভুক্ত করে, চাট্টি উৎসব তার মধ্যে অন্যতম। ১৯৯৫ সালে প্রকাশিত *মহুলবনীর সেরেঞ* উপন্যাসের সময়কাল সম্পর্কে ঔপন্যাসিক তপন বন্দ্যোপাধ্যায় লিখছেন- "এই কাহিনীর সময়কাল ১৯৮৫-৮৬ যেসময়ে নিস্তরঙ্গ, নিরীহ, অথচ প্রাণপ্রাচুর্যে ভরা সাঁওতাল জনজীবন উত্তাল হতে শুরু করেছে ঝাড়খন্দ-আন্দোলন"[১১]। উপন্যাসে ঝাড়খণ্ড আন্দোলনের প্রসঙ্গ থাকলেও তা মূল উপজীব্য হয়ে ওঠেনি; বরং একটা বিশেষ জনগোষ্ঠীর সামাজিক রীতিনীতি, বিশ্বাস-সংস্কার, উৎসব-পরব ইত্যাদির সুরই ধ্বনিত হয়েছে। একটা বিশেষ অঞ্চলের নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর জীবনের গান, সমাজজীবনের "সেরেঞ"ই *মহুলবনীর সেরেঞ*। বিভিন্ন আদিবাসী সমাজের সামাজিক-সাংস্কৃতিক যে জীবনধর্মের চিত্র উপন্যাসগুলিতে উঠে এসেছে তাতে দেখা যায় আদিবাসী গোষ্ঠীর সামাজিক, সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানে প্রকৃতি বা প্রকৃতির উপাদান বিশেষ ভূমিকা পালন করে। আদিবাসীরা শুধুমাত্র আস্তিকই নয়, ঈশ্বরের ধারণায় তারা সর্বপ্রাণবাদে বিশ্বাসী, স্পষ্টত জড়বাদী। এই সমাজের অতিপ্রাকৃত শক্তির প্রতি ভয় ও অন্ধবিশ্বাস - দুইই প্রবল। জাদুমন্ত্র ও ডান-বিদ্যাচর্চা বিশেষভাবে প্রচলিত। নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশার

সুযোগ থাকলেও তা সামাজিক নিয়ম বা অনুশাসন মেনেই, বিবাহের ক্ষেত্রের সামাজিক বিধি-নিষেধ বা নিয়ম অবশ্য পালনীয়। সামাজিক অনুশাসন লঙ্ঘিত হলে কখনও কখনও তা কঠিন শাস্তিযোগ্য হয়ে ওঠে। মানুষের পারস্পরিক সম্পর্কের, নর-নারীর প্রেম-ব্যথা-বেদনার চিরন্তন ভাষ্য হয়েও উপন্যাসগুলি শেষ পর্যন্ত হয়ে উঠেছে কোনো বিশেষ সমাজের আলেখ্য।

চতুর্থ অধ্যায়

স্বাধীনতা-উত্তর বাংলা উপন্যাস : আদিবাসী সম্প্রদায়ের আর্থ-জীবন – অভিঘাত ও পালাবদল

প্রাক্-ব্রিটিশ সময় থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত ভারতের আদিবাসী জীবনকে পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যাবে তাদের জীবনের সঙ্গে লগ্ন থাকা শোষণের বা বঞ্চনার ধারণা মূলত আর্থিক। এই বিস্তৃত সময়পর্বের তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থায় ব্যাপক পরিবর্তন ঘটেছে, সেই বিবর্তনকে এভাবে দেখা যেতে পারে - প্রাক্-ব্রিটিশসময়কাল থেকে ব্রিটিশ শাসনের গোড়ার দিক পর্যন্ত, তার পরবর্তী সময় থেকে স্বাধীনতা পর্যন্ত এবং স্বাধীনতা থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত। প্রথমপর্বে আদিবাসীরা মূলস্রোতের সমাজব্যবস্থা থেকে দূরে জঙ্গলে বা পাহাড়ের কোল ঘেঁষে ছোট ছোট গ্রামে চাষাবাদ, পশুপালন বা জঙ্গল নির্ভর নিজস্ব ও স্বয়ং সম্পূর্ণ আর্থিক ব্যবস্থা গড়ে তুলেছিল। পরবর্তী পর্যায়ে ব্রিটিশ শাসক প্রণীত “চিরস্থায়ী ব্যবস্থা” তাদের আর্থ-সামাজিক জীবনে প্রথম আঘাত নিয়ে আসে। ব্রিটিশ প্রশাসকের এই ব্যবস্থা যেমন তাদের বন কেটে তৈরি করা জমি থেকে উৎখাত করে, তেমনই তাদের জীবনে সুদখোর মহাজনদের অনুপ্রবেশ ঘটায়। এছাড়াও ব্রিটিশ সরকারের “অরণ্য আইন” আদিবাসীদের জঙ্গলের ওপর অধিকার কেড়ে নেয়। খনির আবিষ্কার, শিল্পের প্রসার, কারখানার পত্তন, রেলপথ চালু ইত্যাদি কৃষিজীবী, অরণ্যনির্ভর মানুষদের মজুরে পরিণত করে। স্বাধীনতা-পরবর্তীকালে অবশ্য সরকারী নীতিতে আদিবাসীরা তাদের জমির অধিকার (সংবিধানের পঞ্চম তপশিল অনুযায়ী আদিবাসী জমি হস্তান্তর নিষিদ্ধ বা নিয়ন্ত্রিত), অরণ্যের অধিকার (তপশিলি উপজাতি ও অন্যান্য ঐতিহ্যবাহী অরণ্যবাসী আইন, ২০০৬) ফিরে পায়। কিন্তু শিল্পায়ন, নগরায়ণ ও বিশ্বায়নের ফলে তাদের জমি থেকে উৎখাত হওয়া বা আর্থ-সামাজিক পরিবর্তন এখনও অব্যাহত। অন্যদিকে সংবিধানে শিক্ষা, চাকুরি ও বিভিন্ন ক্ষেত্রে সংরক্ষণের কারণেও পেশাগত পরিবর্তন ঘটছে যা তাদের অর্থনৈতিক ইতিবাচক পরিবর্তন ঘটাচ্ছে। বাংলা উপন্যাসে আদিবাসী জীবনের বাস্তবনিষ্ঠ রূপায়ণের সন্ধান করতে গিয়ে ঔপন্যাসিকেরা তাদের অর্থনৈতিক জীবনের

পরিবর্তনকে কীভাবে ধরেছেন, তা দেখানোর চেষ্টা করেছি এই অধ্যায়ে।

বন্য মহিষের অস্তিত্বের সংকটের সঙ্গে অমিয়ভূষণ মজুমদার মিলিয়ে দিয়েছেন অরণ্যনির্ভর মানুষের বিপন্ন অস্তিত্বকে, *মহিষকুড়ার উপকথা*-য় এই বিপন্ন অস্তিত্বের কথাই তিনি শুনিয়েছেন। উপন্যাসটি প্রথম প্রকাশিত হয় শারদীয়া "পরিচয়" পত্রিকায় ১৩৮৬ সালে। মানবসভ্যতার নিষ্ঠুর আগ্রাসনের বলি অরণ্যজীবন। অরণ্যকে গ্রাস করে বসতি গড়ে উঠেছে, কৃষিক্ষেত্র তৈরি হয়েছে। ঔপন্যাসিক কৃষিসভ্যতার অমোঘকতাকে প্রশ্নহীন করলেন না; বরং কৃষিজমির আগ্রাসনে অরণ্যসভ্যতার বিপন্নতা ও পশ্চাদপসারণ দেখালেন। আবার কৃষিজীবনকেও ভেঙে দিয়েছেন *মহিষকুড়ার উপকথার* প্রায় ২১-২২ বছর আগে লেখা *দুখিয়ার কুঠিতে* (১৩৬৪বঙ্গাব্দ)। একের পর এক গ্রামের বুকে জমি হারানোর বেদনা জাগিয়ে তুলে, রোলার ইঞ্জিনের তীব্র হুঙ্কারে দুখিয়ার কুঠির কৃষকদের বুকে তীব্র অস্বস্তি এনে দুখিয়ার কুঠির দোরগোড়ায় হাজির হয় কালো সড়ক।

রমাপদ চৌধুরীর *অরণ্য আদিম* (১৯৫৮)-এ ঔপন্যাসিক দেখিয়েছেন কৃষিনির্ভর মুণ্ডাদের জীবনে খাদানের আবিষ্কার শুধু তাদের আর্থিক জীবনকেই প্রভাবিত করেনি, ভেঙে দিয়েছে সমাজও। মুণ্ডা গ্রামের প্রায় সবাই হয়ে গেছে খাদানের মজুর, কুলি-কামিন। আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের *পঞ্চতপা* (১৯৫৮) উপন্যাসেও বাঁধ নির্মাণকে কেন্দ্র করে সাঁওতাল গ্রামের আর্থ-সামাজিক ভাঙন দেখালেন লেখক। *শতকিয়া* (১৯৫৮) সুবোধ ঘোষের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ও বৃহৎ উপন্যাস। উপন্যাসের বিস্তৃত আয়তনে ঔপন্যাসিক মধুকুপি গ্রামের আদিম কিসান জীবনের ওপর নেমে আসা ত্রিবিধ আগ্রাসনের ছবি তুলে ধরেছেন - মিশনারি আগ্রাসন, হিন্দু ধর্মের আগ্রাসন এবং অরণ্য ও কৃষিকে ধ্বংসের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেওয়া পুঁজিবাদী শিল্পের আগ্রাসন। অবশ্য সামন্ততান্ত্রিক কৃষিব্যবস্থায় ভূমিহীন কৃষকদের প্রতি বঞ্চনা ও প্রশাসনিক শোষণকেও পাশাপাশি তুলে ধরেছেন যা উক্ত ত্রিবিধ আঘাতের সহযোগী ভূমিকাই পালন করেছে। মধুকুপি গ্রামের দাশু ও মুরলীর দাম্পত্য জীবনের নানাবিধ ওঠা-নামা, যৌন ও সন্তান আকাঙ্ক্ষাকে অবলম্বন করে লেখক মধুকুপির জীবনের ক্রম পরিবর্তনশীলতাকে তুলে ধরেছেন যা মূলত আর্থ-সামাজিক।

১৯৫০-এর মাঝামাঝি সময় থেকে প্রাক্-নকশাল আন্দোলন পর্যন্ত পানশিলার ভাগচাষি গঙ্গা ওঁরাও তথা ওঁরাও জীবনের বাস্তব চেহারা, আর্থ-সামাজিক পরিবর্তন তথা ভাঙা-গড়াই সাধন চট্টোপাধ্যায়ের *উদ্যোগ পর্ব* (১৯৮২) উপন্যাসের মূল বিষয়বস্তু। অভিজিৎ সেনের *রহু চণ্ডালের হাড়*

(১৯৮৫) উপন্যাস যাযাবর বাজিকরদের ছয় পুরুষ ধরে স্থায়িত্ব পাবার দীর্ঘ সংগ্রামের ইতিবৃত্ত। পীতেমের সময়কাল থেকে তার পৌত্রের পৌত্র শারিবার সময় পর্যন্ত, সাঁওতাল বিদ্রোহের সময়কাল থেকে তেভাগা, দেশভাগ ও স্বাধীন দেশে ভোটাধিকার পর্যন্ত এর ব্যাপ্তি। বাজিগরদের ছয়পুরুষের লড়াই উপন্যাসের মূল আখ্যান হলেও স্বল্প পরিসরে স্থান পেয়েছে সাঁওতালদের জমি-জীবন-জীবিকার লড়াই। দেবেশ রায়ের *শিল্পায়নের প্রতিবেদন* উপন্যাসটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১৯৯৬ সালে। উপন্যাসের মূল ভাবনায় জমি, জঙ্গল ও জন্মভূমির অধিকার হারানোর ব্যথাই অনুরণিত। শিল্পের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে চা-মজুরদের ওপর ধর্মীয় আগ্রাসন ও শিল্প বিপর্যয়ের সঙ্গে সঙ্গে আদিবাসী কুলিদের ওপর নেমে আসা আর্থিক সংকট কীভাবে তাদের পারিবারিক ও সামাজিক জীবনকে বিপর্যস্ত করে তোলে – তার চিত্র তুলে ধরেছেন লেখক। আদিবাসী জীবনের আর্থিক সংকট, অভিঘাত ও পালাবদলের কাহিনি উপন্যাসে উঠে আসে তাদের ব্যক্তিক সংকট ও দ্বন্দ্ব-সংঘাতকে সঙ্গে নিয়ে।

পঞ্চম অধ্যায়

স্বাধীনতা-উত্তর বাংলা উপন্যাসে আদিবাসী আন্দোলন ও অন্যান্য আন্দোলনে আদিবাসী সমাজ

ব্রিটিশ শাসনকাল থেকে স্বাধীনতা-উত্তর সময় পর্যন্ত সংঘটিত আদিবাসী আন্দোলনের গতিপ্রকৃতি লক্ষ করলে দেখা যাবে ভারতের আদিবাসী আন্দোলনের প্রকৃতি মূলত সংস্কারমূলক, কৃষি-অরণ্যের অধিকারকেন্দ্রিক ও স্বতন্ত্র জাতিসত্তাকেন্দ্রিক। সংস্কারমূলক আন্দোলনগুলি ছিল ধর্মীয় ও সামাজিক। এই অধ্যায়ে ভারতের আদিবাসী আন্দোলনের যে বাস্তব প্রতিফলন বাংলা উপন্যাসে ঘটেছে – সেই দিকটি তুলে ধরার চেষ্টা আছে। ভারতের আদিবাসী কর্তৃক সংগঠিত আন্দোলনই শুধু নয়, কৃষিক্ষেত্রে অসন্তোষের সঙ্গে সম্পর্কিত কমিউনিস্ট নেতৃত্বাধীন যে আন্দোলনে আদিবাসী মানুষদের ব্যাপক অংশগ্রহণ ছিল, তার সাহিত্যিক নির্মাণ কীভাবে উপন্যাসে ঘটেছে - তার আলোচনাও এই অধ্যায়ে আছে। ব্রিটিশ শাসনকালে চুয়াড় বিদ্রোহ, চাকমা বিদ্রোহ, ছোটনাগপুরের কোল বিদ্রোহ ও মুণ্ডা বিদ্রোহ, গারো বিদ্রোহ, কুকি বিদ্রোহ, সাঁওতাল বিদ্রোহ, টানা ভগত আন্দোলন, নাগা বিদ্রোহ, রিয়াং বিদ্রোহ প্রভৃতি, স্বাধীনতা-প্রাক্কালে তেভাগা আন্দোলন ও পরবর্তীকালে নকশাল আন্দোলন, শ্রীকাকুলামের গিরিজন বিদ্রোহ এবং ঝাড়খণ্ড আন্দোলন প্রভৃতি সংঘটিত হয়। স্বাধীনতা-উত্তরকালে প্রকাশিত বাংলা উপন্যাসে উক্ত আন্দোলনগুলির মধ্যে যেগুলির সাহিত্যিক নির্মাণ ঘটেছে, তাকেই কালানুক্রমে আলোচনার প্রয়াস করা হয়েছে এই অধ্যায়ে।

মেদিনীপুরের চুয়াড় বিদ্রোহের চুয়াড়দের আংশিক পরিচয় পাওয়া যায় তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের *জঙ্গলগড়* (১৯৬৪)-এ এবং তাঁর *অরণ্যবহ্নি* (১৯৬৬)-তে আছে সাঁওতাল বিদ্রোহের প্রসঙ্গ। সাঁওতাল বিদ্রোহকে উপন্যাসের মোড়কে বাস্তবসম্মতভাবে পরিবেশন করেছিলেন মহাশ্বেতা দেবী তাঁর *হুলমাহা* (১৯৮২) উপন্যাসে। বিরসার নেতৃত্বে মুণ্ডা বিদ্রোহকে কেন্দ্র করে রচিত তাঁর বিখ্যাত *অরণ্যের অধিকার*-এ(১৯৭৭) তিনি যে ইতিহাসকেই প্রাধান্য দিয়েছিলেন, তা স্বীকার করে নেন – "লেখক হিসাবে, সমকালীন সামাজিক মানুষ হিসাবে, একজন বস্তুবাদী ঐতিহাসিকের সমস্ত দায়দায়িত্ব বহনে আমরা সর্বদাই অঙ্গীকারবদ্ধ।"[১২] ১৯৪৩ সালে সংঘটিত রিয়াং বিদ্রোহের নায়ক পার্বত্য চট্টগ্রামের রতনমণি নোয়াতিয়া। প্রাথমিকভাবে রতনমণির উদ্দেশ্য ছিল গরিব রিয়াংদের মধ্যে ধর্মভাব জাগিয়ে তোলা। অথচ সাধারণ গরীব রিয়াংদের ওপর সরকারঘনিষ্ঠ কর্তৃক সামাজিক বঞ্চনা, অত্যাচার ও আর্থিক শোষণকে এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব ছিল না বলেই একটা সময় রিয়াংরা রতনমণির নেতৃত্বে শোষণহীন স্বাধীন রিয়াং রাজ্য গঠনের স্বপ্নে বিদ্রোহী হয়ে ওঠে এবং সেই ইতিহাসকে উপন্যাসের আঙ্গিকে বাঁধলেন শক্তিপদ রাজগুরু *রতনমণি, রিয়াং* (১৯৭৮)-এ।

স্বর্ণ মিত্রের *গ্রামে চলো* (১৯৭২) স্বাধীনতা-উত্তর ভারতের সীমান্তবাংলার রুক্ষ পটভূমিতে সামন্ততান্ত্রিক কৃষিব্যবস্থা, মহাজনী শোষণ, আদিবাসী মানুষগুলোর নিত্য লড়াই ও ঝরিয়ার সাঁওতালপল্লির দারিদ্র্য দুর্দশালাঞ্ছিত জীবনকে তুলে ধরেছে। জয়ন্ত জোয়ারদারের *এভাবেই এগোয়* (১৯৭৮)-তে দেখি সাঁওতাল অধ্যুষিত গাজল, হরিপুর আর বামনগোলায় জিতু সাঁওতালের নেতৃত্বে কৃষক আন্দোলনের একটা গর্বের অতীত ছিল, সেই পটভূমিতেই আরও লক্ষ জিতু সাঁওতাল তৈরির উদ্দেশ্যকে বুকে নিয়ে গৌতমরা রওনা হয়েছিল কলকাতা থেকে মালদায়। ভারতজুড়ে গড়ে ওঠা লড়াই ও অন্ধ্রপ্রদেশের শ্রীকাকুলামের সাফল্যের কথা বারবার এসেছে উপন্যাসে। সাঁওতালদের মধ্যে আন্দোলনের জন্য স্কোয়াড গড়ে তোলার কথা, অত্যাচারী অনাদি রায়ের ওর বাড়ির সাঁওতাল চাকর সুক্কাকে পিটিয়ে মেরে ফেলার কথা, টুডুর নেতৃত্বে সেই অনাদির ওপর খতম অভিযানের চেষ্টা ও না পারার কাহিনি শোনান ঔপন্যাসিক। অরণ্যনির্ভর আদিবাসীদের কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া হয়েছে জঙ্গলের অধিকার, লুঠ করা হয়েছে জমি। কখনও খনি আবিষ্কার, কখনও বাঁধ নির্মাণকে কেন্দ্র করে সরকারও উদ্বাস্তু করেছে আদিবাসীদের, অধিগ্রহণ করেছে জমি। সুবর্ণরেখা বাঁধ প্রকল্পের অঙ্গ খড়কাই নদী বাঁধ প্রকল্পকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষ বাঁধে, আদিবাসীদের পক্ষে এই বাঁধ প্রকল্পের বিরুদ্ধে এই সংঘর্ষে নেতৃত্ব দিয়েছিল ইলিয়াগড়ের গঙ্গারাম কালুন্ডিয়া।

মহাশ্বেতা দেবীর লেখা *সুরজ গাগরাই* (১৯৮৩) উপন্যাসের সুরজ গাগরাই আসলে গঙ্গারামই। মানব চক্রবর্তী তাঁর *ঝাড়খণ্ড ও তুতুরির স্বপ্ন* (১৪০১ বঙ্গাব্দ) উপন্যাসে মানব-মানবীর ভালোবাসার স্বপ্নকে রূপায়িত করেছেন ঝাড়খণ্ড আন্দোলনের আবহে। উপন্যাসের সময়কাল স্বাধীনতার ছেচল্লিশ বছর পরের অর্থাৎ ১৯৯৩ সাল নাগাদ। স্বাধীনতার এতগুলো বছর পরেও সিংদোয়ারি, লোহাপাড়া, চন্দ্রটিপা প্রভৃতি গ্রামে খাবার জল নেই, চাষের জমি নেই, বিদ্যুৎ নেই। এলাকার অধিকাংশ লোক ভিটামিনের অভাবজনিত অসুখে ভোগে। স্বাধীনতার পরে যা কিছু উন্নয়ন, ড্যাম নির্মাণ তা তাদের জমিকেই শুধু আত্মসাৎ করেছে, দেয়নি কিছুই। পাহাড়ের পাথর চলে গেছে শহরে, ড্যামের ফলে আলোয় মুড়েছে শহর, আর আলোর তলার অন্ধকারের মতো এই আদিবাসী মানুষগুলো জমি হারিয়ে তলিয়ে গেছে অন্ধকারে - আর সে নিয়ে মাথা ব্যথা নেই সরকারের। এই পরিস্থিতিতে ঝাড়খণ্ড আন্দোলনের ধ্বনি ওঠে। অথচ সেই স্বতন্ত্র রাজ্যও সেখানকার মূল অধিবাসীদের প্রকৃত সমস্যার সমাধান করতে পারবে কিনা - তা নিয়েও তৈরি হয়েছে সংশয়। ঔপন্যাসিক এই আন্দোলনকে কেন্দ্র করে সাধারণ আদিবাসী মানুষের অবস্থান, তাদের বাস্তব অবস্থা এবং তুতুরির দ্বন্দ্ব দেখিয়েছেন। মাটি ও মানুষের দ্বন্দ্বে ক্ষত বিক্ষত হয়েছে উপন্যাসের নায়ক তুতুরি। এভাবে আন্দোলনের ইতিহাস নির্মাণ করে উপন্যাসের পটভূমি।

ষষ্ঠ অধ্যায়

উচ্চবর্গের দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতা ও আদিবাসী জীবন

সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতার বিন্যাসের সঙ্গে যুক্ত উচ্চবর্গ ও নিম্নবর্গের ধারণা। 'নিম্নবর্গ' শব্দটি ইংরেজি "subaltern" শব্দের বাংলা পরিভাষা। ইতালির কমিউনিস্ট নেতা ও দার্শনিক আন্তোনিও গ্রামশি ফ্যাসিস্ত শাসক মুসোলিনির জেলে বন্দি থাকার সময়ে লেখেন *A Prisoner's Notebook*। এই গ্রন্থে তিনি প্রথম "সাবলটার্ন" শব্দের ব্যবহার করেন। ইতিহাস সমাজবিজ্ঞানের পরিসরে বিশ শতকে ঢুকে পড়ল "নিম্নবর্গের"তত্ত্ব। আর সেইসঙ্গে সাহিত্যের পরিসরেও। ভারতের পটভূমিতে "উচ্চবর্গ" ও "নিম্নবর্গে"র ধারণাকে ইতিহাসবিদ্ রণজিৎ গুহ বোঝাতে চেয়েছেন ব্রিটিশশাসিত ভারতের ক্ষমতাবিন্যাসের সূত্র ধরে। "উচ্চবর্গ" বলতে তিনি বুঝেছেন ইংরেজশাসিত ভারতের প্রভুশক্তির অধিকারীদের, যার মধ্যে বিভাজন করেছেন দেশি প্রভু ও বিদেশি প্রভুর। বিদেশি প্রভুগোষ্ঠীকে আবার ভাগ করেছেন দুই ভাগে – সরকারি প্রভুগোষ্ঠী অর্থাৎ অভারতীয়

কর্মচারী এবং বেসরকারি প্রভুগোষ্ঠী অর্থাৎ বিদেশি শিল্পপতি, মিশনারি, বণিক প্রমুখ। দেশি প্রভুগোষ্ঠী মধ্যে একধরন হল যারা বৃহৎ ভারতীয় প্রভুগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত, কিন্তু বিশেষ অবস্থায় বিশেষ অঞ্চল বা স্থানে সক্রিয়, অন্যধরন হচ্ছে যারা পুরো অবস্থাতেই আঞ্চলিক বা স্থানীয়। শুধু তাই নয়, যারা নিজস্ব সামাজিক অবস্থান বা সত্তার ধর্ম অনুয়ায়ি কাজ না করে প্রভুগোষ্ঠীর স্বার্থে কাজ করে তারাও উচ্চবর্গের মধ্যে পড়ছেন। এই 'উচ্চবর্গের' বিপরীতে তিনি "নিম্নবর্গ" বলে চিহ্নিত করলেন অবশিষ্টদের।[১৩] ক্ষমতার এই বর্গীকরণে প্রান্তে অবস্থানকারী ভারতের আদিবাসী সমাজ "নিম্নবর্গ"। বেশ কিছু উপন্যাসে আদিবাসী সম্প্রদায় বা সমাজের প্রতি উচ্চবর্গীয় চেতনা, দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন ঘটেছে – উপন্যাসে পরিবেশিত সেই দৃষ্টিভঙ্গিকে তুলে আনার প্রয়াস আছে এই অধ্যায়ে। মহাশ্বেতা দেবীর *কবি বন্দ্যঘটী গাঞির জীবন ও মৃত্যু* (১৯৬৭) এবং *টেরোড্যাকটিল পূরণ সহায় ও পিরথা* (১৯৮৭) উপন্যাসদ্বয় দু'টি ভিন্ন পটভূমি ও ভিন্ন সময়কালের হয়েও মূলত আদিবাসীদের প্রতি উচ্চবর্গের অবহেলা ও সামাজিক শোষণকেই ব্যক্ত করে। অবশ্য শেষোক্ত উপন্যাসে আদিবাসীদের প্রতি স্বাধীন ভারতরাষ্ট্র কর্তৃক বঞ্চনার বিরুদ্ধে ঔপন্যাসিকের স্বর শোনা যায়। প্রফুল্ল রায় তাঁর *আকাশের নীচে মানুষ* (১৯৮১) উপন্যাসে দোসাদদের স্বাধীন ভারতেও পরাধীন থাকার আখ্যান শোনাতে গিয়ে দেখিয়েছেন আশেপাশের আদিবাসী জীবনের খিদের জন্য সংগ্রামকে। সারাবছর উচ্চবর্গের জমিতে ভূমিদাসেরা কাজ করলেও বছরের কোনো কোনো সময় খেতের বিপুল কাজ ও ফসল তোলার জন্য প্রতি বছর আদিবাসী মানুষজন আসে। চাহাড়ের হাটে চলে নির্বাচন। স্রেফ পেটভাতা, সামান্য মজুরি, কিলোখানেক মকাই বা জনাই বা গুমো আতপ চালের বিনিময়ে উদয়স্ত পরিশ্রমের সুলভ খেতমজুর গরিব আদিবাসীরা ছাড়া কেই বা হতে পারত। হাটে ক্ষেতমজুরের যে নির্বাচন প্রক্রিয়া চলে সেটা যে কোনো গোহাটাকেও হার মানাবে। গা-হাত টিপে দেখে নিতে হয় ক্ষেতের কাজের পরিশ্রমের উপযুক্ত কিনা! সারাবছর খিদের সঙ্গে লড়াই করা মানুষের মধ্যে বেছে নেওয়া হয় শক্ত-সমর্থকে। দুর্বলেরা বাতিল। আরও কঠিন লড়াই তাদের জন্য অপেক্ষা করে থাকে। ভূমিদাসদের প্রতি যেমন, এই মরশুমি কিষানদের প্রতিও তেমনই ঝরে পড়ে উচ্চবর্গীয় ঘৃণা। ব্রিটিশ শাসক কর্তৃক লোধাদের ওপর "অপরাধপ্রবণ জাতি"র অপবাদ আইনের খাতায় কলমে তুলে নেওয়া হলেও মানসিকতা থেকে যে অপসৃত হয়নি, তার উদাহরণ হতে পারে ভগীরথ মিশ্রের *তস্কর* (১৯৯২) উপন্যাসটি। আন্তরিক প্রচেষ্টা সত্ত্বেও উচ্চবর্গের স্বার্থ ও ষড়যন্ত্রে গোক্ষুর ভক্তা তার "চোর" জীবন ও অপবাদ থেকে মুক্তি পায় না। ভগীরথ মিশ্র রচিত

আড়কাঠি ও বুদ্ধদেব গুহের *কোজাগর*-এ আদিবাসীদের প্রতি উচ্চবর্গের বৈষম্যমূলক আচরণ ও ঘৃণা প্রকাশ পেয়েছে। এভাবে উপন্যাসগুলি হয়ে উঠেছে সমাজের উচ্চবর্গের মানসিকতার দর্পণ আর এই দৃষ্টিভঙ্গি ও মানসিকতাকে অন্বেষণের প্রয়াসই আছে এই অধ্যায়ে।

উপসংহার

১৯৪৭ থেকে ২০০০ সাল পর্যন্ত বিস্তৃত সময়পর্বে বাংলা উপন্যাসের ক্যানভাসে সচেতন ঔপন্যাসিকদের কলম আদিবাসী জীবনকে বাস্তবনিষ্ঠ প্রতিষ্ঠা দিয়েছে। ধর্মীয় সংস্কার ও সামাজিক অনুশাসন বা প্রথায় আবদ্ধ আদিবাসী সমাজ-ব্যবস্থাই শুধু নয়, তাদের প্রতি অনাদিবাসীদের অর্থনৈতিক শোষণ, সাংস্কৃতিক আগ্রাসন ও মানসিক ঘৃণার চর্চা সময়ভেদে রূপ পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে যে ধারাবাহিকভাবে ঘটে চলেছে, নিজস্ব সত্যনিষ্ঠায় উপন্যাসে তাকে প্রতিষ্ঠা করেছেন ঔপন্যাসিকেরা। নৃতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব ও ইতিহাসের আলোকে সেই সত্যকেই দেখেছি এই গবেষণায়। উপসংহারে এসে মনে হয়েছে, মানব-মানবীর সম্পর্কের ও হৃদয় রহস্যের জটিল আবর্ত পেরিয়ে এই উপন্যাসগুলো হয়ে উঠেছে গোষ্ঠীজীবনের দলিল, অনালোকিত ইতিহাসের চর্চা, নির্মাণ। ভারতের মূলস্রোতের জীবন-সমাজ-সংস্কৃতির ইতিহাসের পাশে এই উপন্যাসগুলো হয়ে উঠেছে বিকল্প ইতিহাস। ২০০০ সাল পরবর্তী সময়েও উপন্যাসে এই ধারার চর্চা অব্যাহত, ফলে বিস্তৃত সময়পর্ব ধরে যে ধারা নিজের গতিতে বয়ে চলেছে নতুন জগতের সন্ধান দিতে দিতে, তাকে কেন্দ্র করে এ জাতীয় গবেষণার পরিসর বাড়ছে এবং আরও নানাবিধ দিক অনুসন্ধানের অবকাশও থেকে যাচ্ছে। আমার এই গবেষণাকাজটি ভবিষ্যতের সেই গবেষণার ক্ষেত্রে সহায়ক কোনো সূত্রের সন্ধান দিতে পারবে বলে আমার মনে হয়।

তথ্যসূত্র :

১। *List of Scheduled Tribes of West Bengal*, Tribal Devolopment Department, W.B, www.adibasikalyan.gov.in

২। আশাপূর্ণা দেবী, “নিজের আয়নায়”, *পশ্চিমবঙ্গ পত্রিকা,* শৈলজানন্দ জন্মশতবর্ষ বিশেষ সংখ্যা, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার ১৪০৭, পৃষ্ঠা - ১০

৩। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, *কল্লোল যুগ,* ডি. এম. লাইব্রেরী, কলকাতা, পরিবর্ধিত দ্বিতীয় প্রকাশ, আষাঢ় ১৩৫৮, পৃষ্ঠা - ৮৩

৪। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, *আরণ্যক,* মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, কলকাতা, চতুর্থ সংস্করণ ১৩৫৮, পৃষ্ঠা - ১৮১

৫। নীহাররঞ্জন রায়, *বাঙ্গালীর ইতিহাস আদিপর্ব,* দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, অষ্টম সংস্করণ বৈশাখ ১৪২০, পৃষ্ঠা – ৫৩

৬। বিনয়ভূষণ চৌধুরী, "উপজাতির 'মিথ' : ধারণার পুনর্বিবেচনা", *বাংলার বহুজাতি : বাঙালি ছাড়া অন্যান্য জাতির প্রসঙ্গ,* ভেলাম ভান সেন্দেল ও এলেন বল সম্পাদিত, আই সি বি এস, দিল্লি, প্রথম প্রকাশ অক্টোবর ১৯৯৮, পৃষ্ঠা – ৬৪

৭। *The Constitution of India* (as on 1st April 2019), Government of India, Ministry of Law and Justice, Legislative Department, 2019, page- 144

৮। আশুতোষ ভট্টাচার্য, *বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস,* কলকাতা বুক হাউস, কলকাতা, ১৩৪৬, পৃষ্ঠা- ৪

৯। ধীরেন্দ্রনাথ বাস্কে, *পশ্চিমবঙ্গের আদিবাসী সমাজ দ্বিতীয় খণ্ড,* বাস্কে পাবলিকেশন, কলকাতা, দ্বিতীয় প্রকাশ ২০১৬, পৃষ্ঠা- ৭

১০। প্রফুল্ল রায়, "লেখকের কথা", *পূর্বপার্বতী,* দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম দে'জ সংস্করণ এপ্রিল ১৯৭৮, পৃষ্ঠা- ৬

১১। তপন বন্দ্যোপাধ্যায়, *মহুলবনীর সেরেঞ,* দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ কলিকাতা পুস্তকমেলা জানুয়ারি ১৯৯৫, পৃষ্ঠা- ৭

১২। মহাশ্বেতা দেবী, "ভূমিকা", "অরণ্যের অধিকার", *মহাশ্বেতা দেবী রচনাসমগ্র অষ্টমখণ্ড,* অজয় গুপ্ত সম্পাদিত, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ এপ্রিল ২০০৩, পৃষ্ঠা- ৭৫

১৩। রণজিৎ গুহ, "নিম্নবর্গের ইতিহাস", *নিম্নবর্গের ইতিহাস,* গৌতম ভদ্র ও পার্থ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, সপ্তম মুদ্রণ নভেম্বর ২০১২, পৃষ্ঠা- ৩২-৩৩

<u>গ্রন্থপঞ্জি</u>

প্রাথমিক বা আকর গ্রন্থ :

১। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *রাজকাহিনী,* আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ষোড়শ মুদ্রণ, মার্চ ২০০৮

২। অভিজিৎ সেন, *রহু চণ্ডালের হাড়,* সুবর্ণরেখা, কলিকাতা, তৃতীয় সংস্করণ, ১৪০৭

৩। অমিয়ভূষণ মজুমদার, "বিনদনি",*অমিয়ভূষণ রচনাসমগ্র ৭,* দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, জানুয়ারি ২০০৯

৪। অমিয়ভূষণ মজুমদার, *মহিষকুড়ার উপকথা ও একটি খামারের গল্প,* দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম দে'জ সংস্করণ, এপ্রিল ২০১৬

৫। অমিয়ভূষণ মজুমদার, "মাকচক হরিণ",*অমিয়ভূষণ রচনাসমগ্র ৮,* দে'জ পাবলিশিং কলকাতা, জানুয়ারি ২০১০

৬। আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, "পঞ্চতপা", *আশুতোষ মুখোপাধ্যায় রচনাবলী দ্বিতীয় খণ্ড,* মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, কলকাতা, ষষ্ঠ মুদ্রণ, ফাল্গুন ১৪২০

৭। কালীপদ ঘটক, *অরণ্য কুহেলি,* পূর্ণবঙ্গ প্রকাশনী, কলিকাতা, প্রথম মুদ্রণ, মহালয়া ১৩৫৬

৮। চণ্ডিকাপ্রসাদ ঘোষাল সম্পাদিত, *অরণ্যসমগ্র বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়,* গাঙচিল, কলকাতা, দ্বিতীয় মুদ্রণ, জুলাই ২০১৬

৯। জয়ন্ত জোয়ারদার, *এভাবেই এগোয়,* বুক মার্ক, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, অক্টোবর ১৯৫৮

১০। তপন বন্দ্যোপাধ্যায়, *টাঁড় বাংলার উপাখ্যান,* দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, জানুয়ারি ২০০০

১১। তপন বন্দ্যোপাধ্যায়, *মহুলবনীর সেরেঞ,* দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, কলিকাতা পুস্তকমেলা, জানুয়ারি ১৯৯৫

১২। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, "অরণ্যবহ্নি", *তারাশঙ্কর রচনাবলী অষ্টাদশ খণ্ড,* মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, কলকাতা, ষষ্ঠ মুদ্রণ, মাঘ ১৪১৮

১৩। দেবেশ রায়, *শিল্পায়নের প্রতিবেদন,* দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ কলিকাতা পুস্তকমেলা, জানুয়ারি ১৯৯৬

১৪। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, "মন্দ্রমুখর", *নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় রচনাবলী দ্বিতীয় খণ্ড,* আশা দেবী ও অরিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় সম্পাদিত, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, কলকাতা, দ্বিতীয় মুদ্রণ, মাঘ ১৩৮৮

১৫। নারায়ণ সান্যাল, *দণ্ডক-শবরী,* দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ, জুলাই ২০১৫

১৬। প্রফুল্ল রায়, *আকাশের নীচে মানুষ,* দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, অষ্টাদশ সংস্করণ, মার্চ ২০১৭
১৭। প্রফুল্ল রায়, *পূর্বপার্বতী,* দে'জ পাবলিশিং, কলিকাতা, প্রথম দে'জ সংস্করণ, এপ্রিল ১৯৭৮
১৮। বিমল সিংহ, "লংতরাই", *বিমল সিংহ রচনাসংগ্রহ,* ত্রিপুরা দর্পণ, আগরতলা, প্রথম প্রকাশ ১৯৯৯
১৯। বুদ্ধদেব গুহ, *কোজাগর,* দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, সপ্তচত্বারিংশ সংস্করণ, জানুয়ারি ২০১৭
২০। বুদ্ধদেব গুহ, *পারিধী,* দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, চতুর্থ সংস্করণ, আগস্ট ১৯৯৩
২১। বুদ্ধদেব গুহ, *সাসান্‌ডিরি,* আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, সপ্তম মুদ্রণ, জুন ২০১২
২২। ভগীরথ মিশ্র, *আড়কাঠি,* দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, তৃতীয় সংস্করণ, জানুয়ারি ২০০৮
২৩। ভগীরথ মিশ্র, "জানগুরু", *দু'টি উপন্যাস,* দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, জানুয়ারি ২০১৬
২৪। ভগীরথ মিশ্র, *তস্কর,* দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ফেব্রুয়ারি ১৯৯২
২৫। মহাশ্বেতা দেবী, "অরণ্যের অধিকার", *মহাশ্বেতা দেবী রচনাসমগ্র অষ্টম খণ্ড,* অজয় গুপ্ত সম্পাদিত, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, এপ্রিল ২০০৩
২৬। মহাশ্বেতা দেবী, *কবি বন্দ্যঘটি গাঞির জীবন ও মৃত্যু,* করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ, আশ্বিন ১৪১০
২৭। মহাশ্বেতা দেবী, "চোটি মুণ্ডা এবং তার তির", *মহাশ্বেতা দেবী রচনাসমগ্র নবম খণ্ড,* অজয় গুপ্ত সম্পাদিত, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, এপ্রিল ২০০৩
২৮। মহাশ্বেতা দেবী, "টেরোড্যাকটিল,পূরণসহায় ও পিরথা", *মহাশ্বেতা দেবী রচনাসমগ্র পঞ্চদশ খণ্ড,* অজয় গুপ্ত সম্পাদিত, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ, জুলাই ২০১৫
২৯। মহাশ্বেতা দেবী, *ব্যাধখণ্ড,* দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ কলিকাতা পুস্তকমেলা, জানুয়ারি ১৯৯৪
৩০। মহাশ্বেতা দেবী, "সুরজ গাগরাই", *মহাশ্বেতা দেবী রচনাসমগ্র দ্বাদশ খণ্ড,* অজয় গুপ্ত সম্পাদিত, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ, এপ্রিল ২০১৪
৩১। মহাশ্বেতা দেবী,"হুলমাহা", *মহাশ্বেতা দেবী রচনাসমগ্র একাদশ খণ্ড,* অজয় গুপ্ত সম্পাদিত, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, জুলাই ২০০৩
৩২। মানব চক্রবর্তী, *ঝাড়খণ্ড ও তুতুরির স্বপ্ন,* মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, অগ্রহায়ণ ১৪০১
৩৩। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, "দর্পণ", *মানিক গ্রন্থাবলী পঞ্চম খণ্ড,* গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড,

কলকাতা, বিশেষ সংস্করণ, ১৫ই এপিল ১৯৭৪
৩৪। শক্তিপদ রাজগুরু, *রতনমণি, রিয়াং,* পূর্বাচল, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, মে ১৯৭৮
৩৫। সমরেশ বসু, *দুই অরণ্য,* আনন্দ পাবলিশার্স, কলিকাতা, দ্বিতীয় মুদ্রণ, আশ্বিন ১৩৭১
৩৬। সাধন চট্টোপাধ্যায়, "উদ্যোগ পর্ব", *উপন্যাস সমগ্র (তৃতীয়),* করুণা প্রকাশনী, প্রকাশকাল অনুল্লিখিত
৩৭। সুবোধ ঘোষ, "শতকিয়া", *সুবোধ ঘোষ রচনাসমগ্র ৩,* উত্তম ঘোষ ও সমীরকুমার নাথ সম্পাদিত, নাথ ব্রাদার্স, কলকাতা, জানুয়ারি ১৯৯৮
৩৮। সৈকত রক্ষিত, *আকরিক,* শিল্প সাহিত্য, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, সেপ্টেম্বর ১৯৮৪
৩৯। স্বর্ণ মিত্র, *গ্রামে চলো,* ল্যাম্পপোস্ট, ঢাকা, জানুয়ারি ২০১৭
৪০। স্বর্ণকুমারী দেবী, "বিদ্রোহ", *স্বর্ণকুমারী দেবীর রচনাবলী,* শ্রীমতী বাণী রায় সম্পাদিত, রামায়ণী প্রকাশ ভবন, কলিকাতা, প্রথম প্রকাশ, ২৫শে বৈশাখ, ১৩৬৪

সহায়ক গ্রন্থ (বাংলা) :

১। ড.অতুল সুর, *ভারতের নৃতাত্ত্বিক পরিচয়,* সাহিত্যলোক, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, জুলাই ১৯৮৮
২। অনিল আচার্য সম্পাদিত *সত্তর দশক (প্রথম খণ্ড),* অনুষ্টুপ, কলকাতা, পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত সংস্করণ, জুন ২০১৪
৩। অনিল আচার্য সম্পাদিত *সত্তর দশক (তৃতীয় খণ্ড),* অনুষ্টুপ, কলকাতা, তৃতীয় পরিবর্ধিত সংস্করণ, জানুয়ারি ২০১২
৪। অরুণ চৌধুরী, *সাঁওতাল অভ্যুত্থান ও উপজাতীয়দের সংগ্রাম,* এন বি এ, কলকাতা, দ্বিতীয় মুদ্রণ, বইমেলা ২০০৬
৫। শ্রী আশুতোষ ভট্টাচার্য, *বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস,* কলিকাতা বুক হাউস, কলিকাতা, ১৩৪৬
৬। কমল চৌধুরী সম্পাদিত, *ডাইনি,* দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা পুস্তকমেলা, জানুয়ারি ২০০৩
৭। ক্ষেত্র গুপ্ত, *বাংলা উপন্যাসের ইতিহাস (চতুর্থ খণ্ড),* গ্রন্থনিলয়, কলকাতা, দ্বিতীয় প্রকাশ, জানুয়ারি ২০০৮
৮। গৌতম ভদ্র ও পার্থ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত, *নিম্নবর্গের ইতিহাস,* আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, সপ্তম মুদ্রণ, নভেম্বর ২০১২

৯। ড. চিত্ত মণ্ডল ও ড. প্রথমা রায় মণ্ডল সম্পাদিত, *বাংলার দলিত আন্দোলনের ইতিবৃত্ত,* একুশ শতক, কলকাতা, ২০১৬

১০। চিত্তরঞ্জন দাশ, *পশ্চিমবঙ্গে ভূমিসংস্কার ও ভারতের কৃষি-অর্থনীতি,* এম এল আর সি, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ, মে ২০১০

১১। তড়িৎমোহন দাশগুপ্ত, *বিদ্রোহী রিয়াং নেতা রতনমণি,* উপজাতি গবেষণা অধিকার, ত্রিপুরা সরকার, প্রথম সংস্করণ, মে ১৯৯৩

১২। দীপঙ্কর ঘোষ সম্পাদিত ও সংকলিত, *বাংলা সাময়িকপত্রে আদিবাসী কথা,* লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ২০০৫

১৩। ধনঞ্জয় রায়, *বঙ্গদেশের উত্তরপ্রান্তীয় সাংস্কৃতিক ইতিহাসের ধারা,* অমর ভারতী, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ, ডিসেম্বর ২০১০

১৪। ধীরেন্দ্রনাথ বাস্কে, *আদিবাসী সমাজ ও পালপার্বণ,* লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ, মে ২০০৯

১৫। ধীরেন্দ্রনাথ বাস্কে, *পশ্চিমবঙ্গের আদিবাসী সমাজ (প্রথম খণ্ড),* বাস্কে পাবলিকেশন, কলকাতা, সপ্তম প্রকাশ, সেপ্টেম্বর ২০১৮

১৬। ধীরেন্দ্রনাথ বাস্কে, *পশ্চিমবঙ্গের আদিবাসী সমাজ (দ্বিতীয় খণ্ড),* বাস্কে পাবলিকেশন, কলকাতা, দ্বিতীয় প্রকাশ, জানুয়ারি ২০১৬

১৭। নির্মল ঘোষ, *মহাশ্বেতা দেবী অপরাজেয় প্রতিবাদী মুখ,* করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, বইমেলা ১৯৯৮

১৮। নির্মলকুমার বসু, *হিন্দু সমাজের গড়ন,* বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা, কার্তিক ১৪১৫

১৯। নীতিশ বিশ্বাস সম্পাদিত, *দলিত সাহিত্য,* ঐকতান গবেষণা সংসদ, কলকাতা, তৃতীয় সংস্করণ, ২০০২

২০। নীহাররঞ্জন রায়, *বাঙ্গালীর ইতিহাস আদি পর্ব,* দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, অষ্টম সংস্করণ, বৈশাখ ১৪২০

২১। বাসব দাশগুপ্ত ও শুভংকর গুহ সম্পাদিত, *প্রসঙ্গ ঝাড়খণ্ড,* নীললোহিত, কলকাতা, জানুয়ারি ২০০১

২২। বিনয় ঘোষ, বাংলার *লোকসংস্কৃতির সমাজতত্ত্ব,* প্রকাশভবন, কলকাতা, দ্বিতীয় মুদ্রণ ভাদ্র

১৪১৯
২৩। বুদ্ধদেব দাশ, *শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়,* পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা, জানুয়ারি ২০০৩
২৪। ভেরিয়ার এল্যুইন, *আদিবাসী জগৎ,* মহাশ্বেতা দেবী ও পৃথ্বীশ সাহা অনূদিত, সাহিত্য অকাদেমি, তৃতীয় মুদ্রণ, ২০১১
২৫। ভেলাম ভান সেন্দেল, এলেন বল সম্পাদিত, *বাংলার বহুজাতি : বাঙালি ছাড়া অন্যান্য জাতির প্রসঙ্গ,* আই সি বি এস, দিল্লি, প্রথম প্রকাশ, অক্টোবর ১৯৯৮
২৬। মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়, *গোষ্ঠীজীবনের উপন্যাস,* বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, বইমেলা ২০০৯
২৭। ড. রণজিৎকুমার সমাদ্দার, *বাংলার গণসংগ্রামের পটভূমি,* দে'বুক স্টোর, কলকাতা, এপ্রিল ১৯৯১
২৮। ড. রণজিৎকুমার সমাদ্দার, *সাঁওতাল গণযুদ্ধ ও বাংলা সাহিত্য,* চ্যাটার্জী পাবলিশার্স, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, আশ্বিন ১৩৬২
২৯। রমাপ্রসাদ নাগ, *স্বতন্ত্র নির্মিতি : অমিয়ভূষণ সাহিত্য,* পুস্তক বিপণি, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ২০০২
৩০। শেখর বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিজিৎ দাশগুপ্ত সম্পাদিত, *জাতি, বর্ণ ও সমাজ,* আই সি বি এস, দিল্লি, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ১৯৯৮
৩১। সন্তোষ রাণা ও কুমার রাণা, *পশ্চিমবঙ্গের দলিত ও আদিবাসী* (পরিমার্জিত সংস্করণ), গাঙচিল, কলকাতা, প্রথম গাঙচিল প্রকাশ, ডিসেম্বর ২০১৮
৩২। ড.সরোজমোহন মিত্র, *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবন ও সাহিত্য,* গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, তৃতীয় মার্জিত সংস্করণ, আশ্বিন ১৩৮৯
৩৩। সুপর্ণা লাহিড়ী বড়ুয়া, *ডাইনি হত্যার উৎস সন্ধানে,* সেতু প্রকাশনী, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, জানুয়ারি ২০১৬
৩৪। সুপ্রকাশ রায়, *বিদ্রোহী ভারত,* র‍্যাডিক্যাল, কলকাতা, প্রথম র‍্যাডিক্যাল প্রকাশ, জানুয়ারি ২০১৩
৩৫। সুপ্রকাশ রায়, *ভারতের কৃষক-বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম,* ডি এন বি এ ব্রাদার্স, তৃতীয়

সংস্করণ এপ্রিল ১৯৮০
৩৬। সুবোধ ঘোষ, *ভারতের আদিবাসী,* ন্যাশানাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, চতুর্থ মুদ্রণ নভেম্বর ২০০০
৩৭। সুবোধ দেবসেন, *বাংলা উপন্যাসে আদিবাসী সমাজ,* পুস্তক বিপণি, কলকাতা, কলকাতা পুস্তকমেলা জানুয়ারি ২০১০
৩৮। হরিভূষণ পাল, *'৪৩-এর রিয়াং বিদ্রোহ ও রতনমণি,* সৈকত প্রকাশন, আগরতলা, পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত সংস্করণ, সেপ্টেম্বর ২০১৩

সহায়ক গ্রন্থ (ইংরেজি) :

1. E. T. Dalton, *Descriptive Ethnology of Bengal*, The council of Asiatic Society of Bengal, Calcutta 1872
2. H. H. Risley, *The Tribes and Castes of Bengal,* Vol.-I, The Bengal Secretariat Press, Calcutta 1891
3. H.H. Risley, *The Tribes and Castes of Bengal*, Vol.-II, Firma Mukhopadhyay, Calcutta, 1981
4. Kalikinkar Datta, *The Santal Insurrection of 1855-57*, Gyan Publishing House, New Delhi, Indian Print 2017
5. K. S. Singh, *Birsa Munda and his movement 1874-1901*, Oxford University Press, 1983
6. Dr. L. P. Vidyarthi (ed), *Applied Anthropology in India,* Kitab Mahal, Allahabad, 2012
7. Manish Kumar Raha, *Matriliny to Patriliny, A study of the Rabha society*, Gain Publishing, New Delhi, 1989
8. Meena Radhakrishna, *Dishonoured by History 'Criminal Tribes' and British Colonial Policy*, Orient Longman, First Published 2001
9. Sarat Chandra Roy, *The Munda and their Country*, The Kuntaline Press,

Calcutta, 1912

10. S.H.M. Rizvi & Shibani Roy, *Naga Tribes of North East India,* B. R. Publishing Corporation, Delhi 2012

11. Verrier Elwin, *Nagaland,* Advisory Secretariat, Shillong, 1961

12. W.W. Hunter, *The Annals of Rural Bengal*, W.B..District Gazetteers, Government of West Bengal, Calcutta, 1996

13. W.V.Garigsion, *The Maria Gonds of Bastar*, Oxford University Press, 1938

সহায়ক পত্র-পত্রিকা (বাংলা) :

১। *আকাদেমি পত্রিকা,* পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, নবম সংখ্যা, এপ্রিল ১৯৯৬

২। *এবং মুশায়েরা,* অমিয়ভূষণ মজুমদার বিশেষ সংখ্যা, চতুর্বিংশতি বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা, জানুয়ারি-মার্চ ২০১৮

৩। *পশ্চিমবঙ্গ পত্রিকা,* শৈলজানন্দ জন্মশতবর্ষ বিশেষ সংখ্যা, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার ১৪০৭,

৪। *বারণরেখা,* আদিবাসী ও লোকসংস্কৃতি, ষষ্ঠ বর্ষ, ষষ্ঠ সংখ্যা, ফেব্রুয়ারি ২০১৭

৫। *যোজনা,* আদিবাসী ও প্রান্তিক গোষ্ঠি সংখ্যা, জানুয়ারি ২০১৪